দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

জাতপাতের রাজনীতি :
বর্তমান সঙ্কট
—পৃঃ ১১

নববর্ষ ও হালখাতা
বাঙালির ঐতিহ্য
—পৃঃ ২৩

৭০ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা।। ১৬ এপ্রিল ২০১৮।। ২ বৈশাখ - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

- রাষ্ট্র নির্মাণে নতুন দিশা দিয়েছিলেন বাবাসাহেব আম্বেদকর : পৃঃ ১৯
- মুসলিম ধর্মান্ধতা ও বাবাসাহেব আম্বেদকর : পৃঃ ৩৫

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা

৭০ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা, ২ বৈশাখ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

১৬ এপ্রিল - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

রাষ্ট্রপতির শাসন ছাড়া এই রাজ্যে গণতান্ত্রিক নির্বাচন সম্ভব নয়
▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ৭

খোলা চিঠি : বুদ্ধিজীবীদের মিছিল আসলে কি শোভাযাত্রা?
▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৯

জাতপাতের রাজনীতি : বর্তমান সংকট
▯ ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস ▯ ১১

বনবাসী গিরিবাসী মানুষদের সংস্কৃতির রক্ষণাবেক্ষণে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ১৬

রাষ্ট্র নির্মাণে নতুন দিশা দিয়েছিলেন বাবাসাহেব আম্বেদকর
▯ রমেশ পতঙ্গে ▯ ১৯

নববর্ষ ও হালখাতা বাঙালির ঐতিহ্য
▯ নন্দলাল ভট্টাচার্য ▯ ২৩

পুরনো কলকাতার বাঙালি কারিগর
▯ রাজা দাশগুপ্ত ▯ ২৭

পয়লা বৈশাখের বর্ষবরণ ▯ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ▯ ৩১

মুসলিম ধর্মান্ধতা ও বাবাসাহেব আম্বেদকর
▯ অর্জুন গোস্বামী ▯ ৩৫

ভারতের সংবিধান ও ড. আম্বেদকর স্মরণ
▯ তরুণ বিজয় ▯ ৩৭

প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র সঙ্গীত জগতে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে ▯ অমিত ঘোষ দস্তিদার ▯ ৪০

হিন্দু ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নববর্ষ
▯ স্বামী মৃগানন্দ ▯ ৫০

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ৪৩-৪৪ ▯ **রঙ্গম : ৪৫** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ৪৬** ▯

অন্যরকম : ৪৭ ▯ **নবাঙ্কুর : ৪৮-৪৯**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রহসনের পঞ্চায়েত

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ভোট প্রহসনে পরিণত হয়েছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করার পর থেকেই শুরু হয়েছে তৃণমূলের জহ্লাদ বাহিনীর অত্যাচার। প্রতিদিনই বিরোধী দলের নেতা-কর্মীরা মার খাচ্ছেন। কাঁচির আঘাতে রক্তাক্ত বিজেপি নেতার ছবি প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক সংবাদপত্রে। জহ্লাদ বাহিনীর আক্রমণে বাঁকুড়ায় মারা গেছেন বিজেপির পঞ্চায়েত প্রার্থী। মাথা ফেটেছে প্রাক্তন বিধায়কের। এই অবস্থায় ধরেই নেওয়া যায় মানুষকে ভোট দিতে দেওয়া হবে না। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয় : পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূলের গুণ্ডামি এবং বিজেপির সম্ভাবনা। লিখবেন— অমলেশ মিশ্র, তরুণ পণ্ডিত, সাধন কুমার পাল প্রমুখ।

।। দাম একই থাকছে ।।

।। দশ টাকা মাত্র।।

শুভ নববর্ষ ১৪২৫ উপলক্ষে স্বস্তিকার পাঠক-পাঠিকা, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

— স্বঃ সঃ

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ

জানকী তীর্থম্

আয়ুর্বেদিক ঔষধের দোকান

নেতাজী সুভাষপল্লী, গাজোল, মালদা

প্রো ঃ স্বপন চক্রবর্তী

কথা - ৯৫৯৩৮৮৬৬১২

ধূলিকণা সর্ব্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্ব্বে সন্তু নিরাময়া।

প্রোঃ- সীমা চক্রবর্তী

স্বপন চক্রবর্তী

সকল প্রকার রোগের অভিজ্ঞ আয়ুর্বেদ চিকিৎসক

সময়- সকাল ৯ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা।

মোঃ ৯৪৩৪৮১৯৭৬০

প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদ ঔষধ বিক্রেতা। | নেতাজী সুভাষ পল্লী, গাজোল, মালদা।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বিভাজনের রাজনীতি

১৪২৫ বঙ্গাব্দের নববর্ষের সূচনা লগ্নে সারা দেশ জুড়িয়া এক অস্থিরতার পরিবেশ লক্ষ্য করা যাইতেছে। সম্প্রতি দেশের শীর্ষ আদালত ১৯৮৯ সালে তপশিলি জাতি-তপশিলি উপজাতি নির্যাতন রোধ আইনের অপব্যবহার রুখিতে এক রায় দিয়াছেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে ভারত বন্‌ধের ডাকে দেশ জুড়িয়া, বিশেষত মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানে এক অরাজকতার পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হইয়াছে। বনধের নামে গাজিয়াবাদে এইমসের চিকিৎসকদের বাসে পাথর ছোঁড়া, গাড়ি জ্বালাইয়া দেওয়া, দোকানপাট লুঠ করা এবং ৯ জন মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যদিও ভারত বন্‌ধের দিনই কেন্দ্রীয় সরকার এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানাইয়া রিভিউ পিটিশন দায়ের করিয়াছে। প্রশ্ন হইল, এই অযৌক্তিক বন্‌ধ কাহার উপর চাপ সৃষ্টি করিবার জন্য ডাকা হইয়াছিল? সংবিধান প্রণেতা ড. ভীমরাও আম্বেদকরের ছবি হাতে লইয়া তাঁহার নামে জয়ধ্বনি দিয়া আন্দোলনকারীরা যাহা করিয়াছেন তাহা যে সংবিধান বিরোধী ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্ট তাহা জানাইয়া দিয়াছে। আদালতের রায় সঠিক কি বেঠিক তাহা অন্য প্রসঙ্গ। কিন্তু বন্‌ধ ডাকিয়া আন্দোলনকারীরা প্রথমেই দেশের আদালত ও আইনকানুনকে যে চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

লক্ষণীয়, যে তিনটি রাজ্যে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিয়াছে, সেই তিনটি রাজ্যেই শাসন ক্ষমতায় রহিয়াছে বিজেপি। বিজেপি দলিত বিরোধী—এই ধারণা প্রচার করিতেই কি বন্‌ধের নামে এই হিংসাশ্রয়ী আন্দোলন? সম্প্রতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ লোকসভায় জানাইয়াছেন যে, এসসি-এসটি আইনে কোনও খামতি রাখা হয় নাই। বরং এই আইন সংশোধন করিয়া আইনটিকে আরও দৃঢ় করা হইয়াছে। তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিদের মধ্যে যাহারা স্বচ্ছল, তাহারাও সংরক্ষণের সুবিধা পাইবে বলিয়া কেন্দ্র সরকারের তরফে শীর্ষ আদালতকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যদিও কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত লইয়া প্রশ্নের অবকাশ আছে, বিশেষত যখন অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (ওবিসি) স্বচ্ছলরা সংরক্ষণের সুবিধা গ্রহণ করিতে পারে না।

ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর প্রথম এই তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন যে, যতক্ষণ না সমাজের অনগ্রসর শ্রেণী নিজেদের আত্মসম্মানের সঙ্গে উঠাইয়া দাঁড়াইবে, ততক্ষণ সমগ্র জাতি কিছুতেই দাঁড়াইতে পারিবে না। বস্তুত রাষ্ট্র নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি এক নতুন দিশা দিয়াছিলেন। ভাগ করো ও শাসন করো—এই নীতিতে ইংরেজের পর কংগ্রেসও একই ধারায় চলিয়াছে। হিন্দুদের বিভাজন করা হইয়াছে নানা গোষ্ঠীতে, 'পাইয়ে দেওয়ার' রাজনীতির নামে তৈরি হইয়াছে ভোট ব্যাঙ্ক। কিন্তু সবাইকে সন্তুষ্ট করা যায় নাই। ক্ষমতা হারাইতে হইয়াছে। ক্ষমতা ফিরাইয়া পাইতে শুরু হইয়াছে বিভেদের খেলা। গুজরাটে পাটিদার আন্দোলন, হরিয়ানার কৃষক বিদ্রোহ, কর্ণাটকে লিঙ্গায়েতদের হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নতুন এক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সৃষ্টি করা হইয়াছে। মূল লক্ষ্য হিন্দু সমাজকে দুর্বল করা। এই একই উদ্দেশ্যে দলিতরা অবহেলিত, নিপীড়নের শিকার—এই অভিযোগে ভারত বন্‌ধের নামে অরাজকতা সৃষ্টি করা হইয়াছে। দলিতদের কিছু স্বঘোষিত নেতা এবং তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা দীর্ঘদিন ধরিয়া দলিতদের বৃহত্তর হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাই দলিতদের নামে বিভাজনের এই রাজনীতিকে রুখিতে পারিলেই বাবাসাহেব আম্বেদকরের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইবে, জাতীয় সংহতি রক্ষিত হইবে। নবর্ষের এই শুভক্ষণে ইহাই হউক আমাদের সংকল্প।

সুভাষিতম্

পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনং।

কার্যকালে সুমৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ ধনং।।

পুস্তকে লিখিত বিদ্যা, অন্যের হাতে যাওয়া সম্পদ প্রয়োজনের সময় কাজে আসে না।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

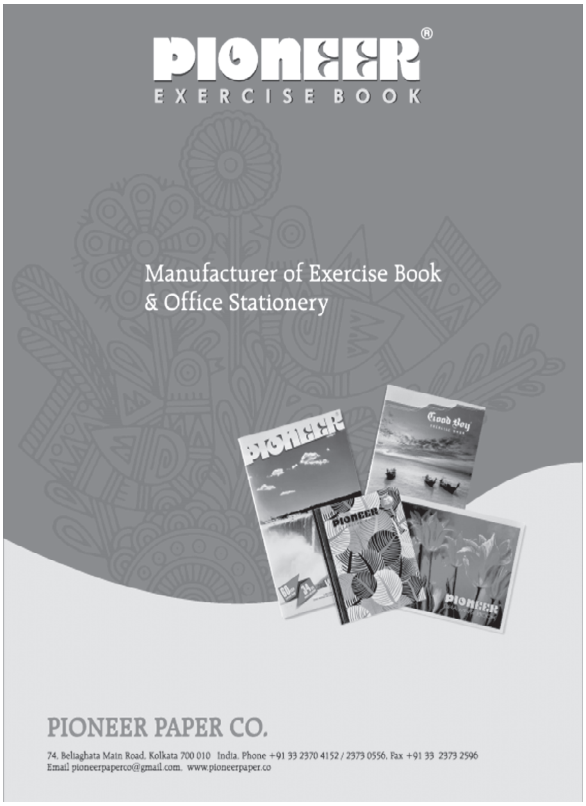

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

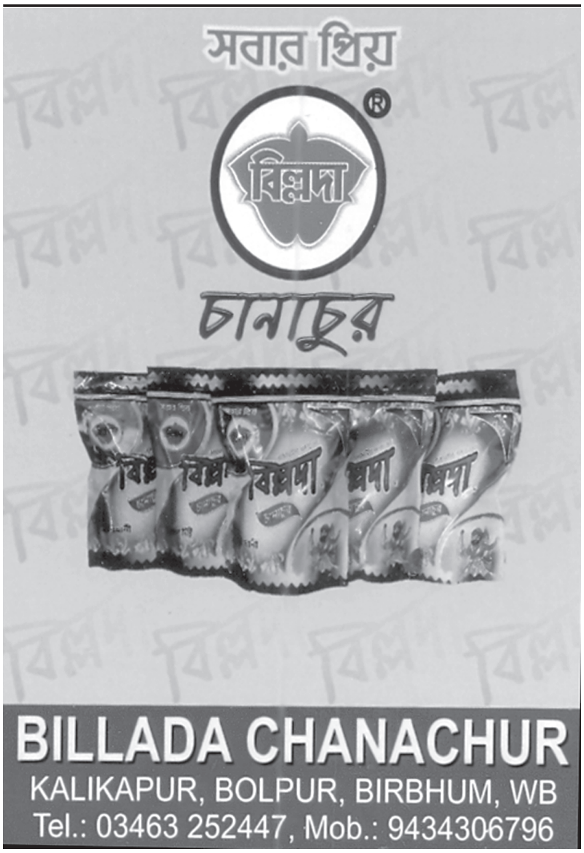

রাষ্ট্রপতির শাসন ছাড়া এই রাজ্যে গণতান্ত্রিক নির্বাচন সম্ভব নয়

গূঢ় পুরুষের কলম

পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ নেই। কারণ, শাসক দলের সর্বোচ্চ নেত্রী প্রকাশ্যে বলছেন রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত সর্বত্র বিরোধীশূন্য করতে হবে। গণতন্ত্রে বিরোধীরা হচ্ছেন ওয়াচ ডগ। পাহারাদার কুকুর। উন্নয়নের নামে সরকারি টাকা নয়ছয় করলে পাহারাদার কুকুররা ঘেউঘেউ করে রাজ্যবাসীকে সতর্ক করবে। সেক্ষেত্রে চটিপিসির ভাই-ভাতিজা দু' চারশো কোটি টাকা কামাবে কীভাবে? তৃণমূলের বিপ্লবী নেতা শুভেন্দু অধিকারী মশাই তো জনসভায় ঘোষণাই করে দিয়েছেন যে, রাজ্যের যেসব গ্রাম পঞ্চায়েত বিরোধীশূন্য হবে তাদের বছরে পাঁচ কোটি টাকার ঠিকাদারি দেওয়া হবে। উন্নয়ন প্রকল্পের নামে দেওয়া পাঁচ কোটি টাকা যে লুঠ হবে তা বলাইবাহুল্য। গ্রামোন্নয়নের নামে এই লুঠের জন্যই পঞ্চায়েতকে বিরোধীশূন্য করার কৌশল নিয়েছেন শাসকদলের নেত্রী। তাই বিরোধী প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র জমা দিতে দিচ্ছে না তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা।

এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে হবে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপিকে। দেরিতে হলেও বিজেপি রাজ্যে প্রতিরোধ গড়ছে। রাজ্য পুলিশের একাংশ এখন তৃণমূলের ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনী। বীরভূম, বাঁকুড়া জেলায় পুলিশ বিরোধীদের মারছে। যেমন, নলহাটি, সিউড়িতে বিজেপি প্রার্থীরা মনোনয়ন পত্র জমা দিতে গেলে বেধড়ক লাঠিচার্জ করা হয়। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। শূন্যে গুলি চালায়। নলহাটিতে মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়ে বেধড়ক মার খান সিপিএম প্রর্থীরা। ঘটনাটি এইরকম— মনোনয়নপত্র পেশ করার জন্য বিজেপির দলীয় প্রার্থীরা দলের দপ্তরে যখন প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তখন পুলিশ সেখানে উপস্থিত হয়। পুলিশ জানায়, মিছিল করে মনোনয়নপত্র পেশ করতে যাওয়া যাবে না। কারণ, ১৪৪ ধারা জারি আছে। ফলে প্রত্যেক বিজেপি প্রার্থীকে আলাদা আলাদা ভাবে প্রস্তাবকদের নিয়ে বিডিও অফিসে যেতে হবে। আগেই খবর ছিল যে বিডিও অফিস তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের দখলে চলে গেছে। বিজেপি প্রার্থীরা নিরাপত্তার দাবি জানালে নলহাটির পুলিশ কর্তারা সাফ জানান পুলিশ নিরাপত্তা দিতে পারবে না। দাবি জানানো হয় বিডিও অফিস থেকে বহিরাগত দুষ্কৃতীদের হঠাতে হবে। এক্ষেত্রেও পুলিশ কর্তারা জানায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের সরানো যাবে না। পুলিশ কর্তারা অনুরোধ জানায় যে, বিজেপি প্রার্থীরা যেন তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা না দেন। উপর মহল থেকে সেরকম নির্দেশ আছে। বিজেপি প্রার্থীরা পুলিশের উপদেশে কর্ণপাত না করায় দলীয় অফিসের ভিতরেই ব্যাপক লাঠিপেটা করা হয়।

কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় না যে পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের নামে জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। সবচেয়ে দুঃখজনক পুলিশের ভূমিকা। একদা পুলিশ বাহিনীর শৃঙ্খলা নষ্ট করতে জ্যোতি বসুরা পুলিশকে ইউনিয়নবাজি করার অধিকার দিয়েছিলেন। তখন সিপিএমের ইউনিয়ন নেতাদের হুমকিতে তটস্থ থাকতেন আই পি এস পদমর্যাদার অফিসাররা। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর পুলিশকে বশংবদ দলীয় কর্মী হিসেবে ব্যবহার করছে। জেলায় জেলায় পুলিশ সুপারদের কাছে নির্দেশ গেছে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতকে বিরোধীশূন্য করতে হবে। পুলিশ কর্তারা রাজ্যের সমস্ত বিডিও অফিসের পথে ১৪৪ ধারা জারি করে বিরোধী দলের প্রার্থীদের দলবদ্ধভাবে মনোনয়নপত্র পেশ করতে দিচ্ছে না। ফলে শাসকদলের দুর্বৃত্তরা সহজেই বিরোধী প্রার্থীদের পিটিয়ে বার করে দিচ্ছে। লড়াকু নকশালপন্থীরা এই কায়দায় মার খেয়েছে ভাঙড়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়ে। পঞ্চায়েত ভোটে ভাঙড়ের পোলেরহাটে পাওয়ার গ্রিড বিরোধী জমি কমিটির নির্দল প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে গেলে পুলিশের উপস্থিতিতে তাঁদের প্রচণ্ড পেটায় তৃণমূল দুষ্কৃতীরা। মনোনয়নপত্র ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়।

গত পঞ্চায়েত ভোটে বিরোধী দলের ২২ জন সমর্থক খুন হন। এঁদের অধিকাংশই দলিত। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত দু'জন বিরোধী দলের সমর্থক মারা গেছেন। তাঁদের একজন দলিত ও অন্যজন মুসলমান। এইরকম জঙ্গলের রাজত্ব যদি চলতেই থাকে তবে ভোটের সময় বাংলা রক্তাক্ত হতে বাধ্য। বামফ্রন্টের জমানায় সিপিএম পঞ্চায়েত ভোটে খুনের রাজনীতি করেছে। সেই নীতি মেনেই চলছে তৃণমূল। নির্বাচনের আগেই তখন দেখা যেত যে দশ হাজার আসনে সিপিএম বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছে। এবারেও সেই একই ছবি দেখবেন রাজ্যবাসী। শুধু সিপিএমের বদলে হবে তৃণমূল। পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন ছাড়া অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। এই সহজ কথাটা ২০১৯ এর সাধারণ নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝতে হবে। ■

"মানুষ যদি আত্মশক্তিতে বলিয়ান না হয়, তবে একটি ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রামে যদি বিশ্বের সব সম্পদ ঢেলে দেওয়া হয়, তাহলেও তার উন্নতি সম্ভব নয়।"

— স্বামী বিবেকানন্দ

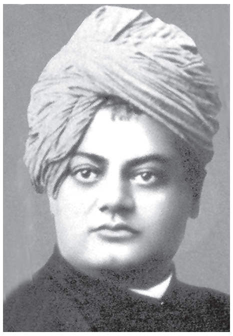

A Well Wisher

(A.B.)

With Best Compliments

From :

S E Builders and Realtors Ltd.

বুদ্ধিজীবীদের মিছিল আসলে কি শোভাযাত্রা ?

মাননীয় বুদ্ধিজীবী সমীপেষু,

গোলমাল হয়েছিল। শান্তিও ফিরছে। তারও বেশ কয়েকদিন পরে শান্তির দাবিতে পথে নামলেন আপনারা। আসানসোল, রানিগঞ্জে সংঘর্ষ থামার পরে থামানোর দাবি নিয়ে এই পথ পরিক্রমার জন্যও নিঃসন্দেহে অভিনন্দন প্রাপ্য কলকাতার খ্যাতনামা নাগরিকদের।

তবে আরও একটু বেশি অভিনন্দন জানানো যেত, যদি এই মিছিলটা সময়কালে হতো। আরও একটু বেশি অভিনন্দন জানানো যেত, যদি কলকাতায় মিছিল না হয়ে শান্তির বার্তা আসানসোল, রানিগঞ্জের আগুনে রাস্তায় পৌঁছনো যেত।

এই রাজ্যে বরাবরই দেখা গিয়েছে 'ওরা', 'আমরা' বিভেদ মুছে আপনারা মানে বিদ্বজ্জনেরা মিছিলে একত্রিত হতে অনেকটা সময় নিয়ে নেন। তাতে অবশ্য অসুবিধার কিছু নেই এবার। মিছিলের অপেক্ষায় অপেক্ষায় আরও একটা আগুন তৈরি হয়ে গিয়েছে। সেই আগুনে অবশ্য কলকাতা নয়, জ্বলছে গ্রাম বাংলা। সেই আগুনের মধ্যেই পথে হাঁটলেন বুদ্ধিজীবী সমাজ। তবে গ্রাম বাংলায় নয়, কলকাতার নিস্তরঙ্গ, শান্ত রাজপথে।

সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম পর্বে বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদ মিছিল দেখেছে কলকাতা, সাক্ষী থেকেছে বাংলা। এই বাংলাই গোটা দেশকে দেখিয়ে দিয়েছে সম্মিলিত প্রতিবাদ কত বড় 'পরিবর্তন' আনতে পারে।

কিন্তু পরিবর্তনের পরে আপনারাও পরিবর্তিত হয়ে গেলেন! অনেকেই অভিযোগ করে থাকেন আপনারা বুদ্ধিজীবীরা নাকি 'সুখের পায়রা', 'শাসকের সুতোয় নাচা পুতুল'। কিন্তু কেন অভিযোগ! অভিযোগ, প্রতিবাদের ধারাবাহিকতা নিয়ে। প্রশ্ন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবাদ হবে, কোনটায় হবে না তার বাছাই নিয়ে।

আসনসোল, রানিগঞ্জে যে গোলমাল হয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আর সেটা শুধু ওই দুই শিল্প শহরেই নয়, গোটা রাজ্যজুড়েই 'রাম' লড়াই চলেছে। সেই লড়াইয়ে শাসকও অংশ নিয়েছে। গোলমালের পরে প্রতিবাদ মিছিল না করে, শান্তির প্রার্থনা না জানিয়ে কেন অশান্তির আগেই উদ্যোগ নেন না প্রখ্যাতরা? কেন রামনবমীর আগেই সমন্বয়ের উদ্যোগ নেওয়া হলো না? কেন সরকারের কাছে সেই দাবি জানানো হলো না?

এই বাংলায় সম্প্রীতির অনেক নজির রয়েছে। আবার এই বাংলা একেবারে ধোয়া তুলসি পাতাও নয়। অনেক বারই ধর্মের ধুয়ো তুলে প্রাণঘাতী লড়াই হয়েছে। ইদানীং, বিজেপির বাড়বাড়ন্তে সেটা বেড়েছে। হিন্দুরা সংগঠিত হতেই আক্রান্ত হতে হচ্ছে। ধুলাগড় থেকে চন্দননগর, উলুবেড়িয়া থেকে কাঁকিনাড়া— উদাহরণ অনেক। দুর্গাপুজো থেকে মহরম সবেতেই রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সমন্বয় বৈঠক করে পুলিশ, প্রশাসন। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে উত্তেজনা ছড়াতে পারে বলে পর্যাপ্ত আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও কোনও সমন্বয় বৈঠক হলো না কেন! না, কোনও প্রশ্ন তোলেননি রাজ্যের বুদ্ধিজীবী মহল। আপনারা তখন ঘুমোচ্ছিলেন। এখন কি তবে শাসকের ডাকে ভাঙল ঘুম?

কবি শঙ্খ ঘোষ, নাট্য ব্যক্তিত্ব রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, চলচ্চিত্র নির্মাতা তরুণ মজুমদার সকলেই বাংলার গর্ব, বাঙালির গর্ব। রবিবারের ভাত ঘুম ছেড়ে ধর্মতলা থেকে রবীন্দ্রসদন শান্তির আহ্বানে মিছিল করলেন।

আর এই মিছিল যখন হচ্ছে, ঠিক তখনই রাজ্যের জেলায় জেলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন নিয়ে রীতিমতো যুদ্ধ চলছে। অধিকাংশ জায়গায় অভিযুক্ত শাসকদল। কোথাও কোথাও পাল্টা মার খাচ্ছে শাসকও। আর সব দেখে সন্ত্রস্ত ভোটাররা।

ভোটের এক মাস আগেই এখান ওখান থেকে মৃত্যুর খবর আসতে শুরু করেছে। রক্তাক্ত বিরোধী দলের জেলাস্তরের নেতা থেকে প্রাক্তন সাংসদ। কিন্তু হায়, বিদ্বজ্জনেদের মিছিলে জায়গা পেল না গ্রাম বাংলার কান্না।

বিদ্বজ্জনেদের রবিবাসরীয় মিছিলের পরে সমাধান নয়, তৈরি হলো নতুন প্রশ্ন— আবার কবে পথে নামবেন বুদ্ধিজীবীরা?

না, আরও প্রশ্ন রয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে বেনজির অশান্তি থেকে চোখ সরিয়ে দিতেই কি এই মিছিল? এ কি প্রতিবাদ, নাকি বুদ্ধিজীবীর শোভাযাত্রা?

—সুন্দর মৌলিক

With the Best Compliments

From :

VAIBHAV HEAVY VEHICLES

LTD.

জাতপাতের রাজনীতি : বর্তমান সংকট

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

ঘাটালের ইড়পালা গ্রামটিতে কিছুদিন আগে একটি মারামারি হয়। গোষ্ঠী-সংঘর্ষ। সাপের খেলা দেখানো, বিষ ঝাড়ার পেশায় যুক্ত মাল-রা গ্রামের প্রান্তে বাস করেন। তারা হিন্দু ভাবাপন্ন— মনসা দেবীকে ঘিরে মন্ত্র-তন্ত্র-তাবিজ-কবচ নিয়ে তাদের জীবনযাপন। তবে গত কয়েক দশক ধরে একটি চোরা স্রোত চলছে। এমনিতে তারা এখন সাপের খেলা দেখানো, বিষ ঝাড়ার পেশা থেকে সামান্য সরে আসছেন; চিকিৎসা-বিদ্যা যুক্তিবাদী বিজ্ঞান আন্দোলনের প্রভাবে তাদের চিরাচরিত পেশা সঙ্কুচিত হচ্ছে। তারা অবশ্য সাপের বিষের ব্যবসায় সরে যাচ্ছেন, এতে তাদের যথেষ্ট অর্থাগম হচ্ছে। জীবন যাপন যাচ্ছে বদলে। ওই গোষ্ঠী-সংঘর্ষের কারণটি অন্যরকম। হিন্দু সমাজের বহু গোষ্ঠীর মতোই মাল-রা মৃতদেহ সমাধিস্থ করেন। গ্রামের শ্মশানের পাশে আছে তাদের সমাধিস্থল। হঠাৎ সেদিন ওই সমাধিস্থলে মাল-রা গোরু জবাই করছেন দেখে গ্রামের অন্য হিন্দুরা তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

হিন্দু সমাজের উচ্চ, মধ্য আর নিম্ন থাকে অপরিচয়ের দূরত্ব যে কী দুর্মর— ইড়পালা গ্রামের ঘটনা তার প্রমাণ। এতদিন বিষ-বিক্রির মাধ্যমে মাল-রা যে আধা-মুসলমান হয়ে গেছেন— সে সংবাদ কেউ রাখেননি। নারায়ণগড়ের কাছে গত বছর দুলে-রা শীতলা পুজো করতে বাধা পেয়েছেন, মাহিষ্য আর তিলি সম্প্রদায় তাদের হিন্দু বলেই গণ্য করেন না! মুর্শিদাবাদ-বীরভূমে মুচিরা দুর্গাপুজো করলে সদগোপরা তাদের মণ্ডপ ভেঙে দেন। এসমস্ত বাস্তব ঘটনা। এসবে চোখ না ফেলে হিন্দু-ঐক্য নিয়ে বক্তৃতা দিয়ে পতাকা নাড়িয়ে তেমন কিছু হবে না।

বাংলার ডোকরা শিল্পীরা, পটিদাররা এমনি। কিছুদিন আগে তারা ছিলেন বাইরে হিন্দু— ভিতরে মুসলমান। কালিঘাটের পটুয়াদের মধ্যে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রচার শুরু হয়; ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ তাদের 'বিশ্বকর্মা'-গোত্র বলে পূর্ণাঙ্গ হিন্দু হিসাবে গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে মেদিনীপুরে-বীরভূমে চিত্রকর-সমাজের মধ্যে। বীরভূমের চিত্রকররাও হিন্দু হিসাবে গৌরবান্বিত হতে থাকেন। বাদ সাধে কমিউমিস্ট পার্টি। তারা আন্দোলন শুরু করে। এতে নাকি জোর করে হিন্দু করানোর ষড়যন্ত্র আছে! মুসলমানরা আরবি অর্থে ভরে দিলে তা হয় ধর্মনিরপেক্ষতা। আর এজন্যই কালিঘাটের পটোপাড়া ক্রমে হিন্দু হয়ে এলেও বীরভূমের চিত্রকরদের ক্ষেত্রে শতকরা শতভাগ সাফল্য আসেনি। কমিউনিস্টরা ভারতে কাদের স্বার্থ রক্ষা করে তা বুঝতে এই তথ্যগুলি সাজানো যায়।

গাজীর পট আঁকা, দেখানো, গান শোনানোর রীতি এখন অবলুপ্তপ্রায়। বাংলাদেশে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে 'সদাগর'-নামে চিহ্নিত বেদেরা এই কাজ করেন। এরাও না-হিন্দু-না-মুসলমান। গবেষকরা জানাচ্ছেন, এখন এরা যাযাবর বৃত্তি ছেড়ে মুসলমান হয়ে যাচ্ছেন। হিন্দু ধর্মের তুলনায় কেন তারা মুসলমান হওয়াটাকে সুবিধার মনে করছেন? বুঝতে অসুবিধা নেই, বাংলাদেশে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতে কেন? এসব প্রশ্নের মীমাংসা করার ইচ্ছা যত্ন সমাজের নেই। বরং তারা খুঁজে বেড়ান নিম্ন বর্ণের তথ্যাভিজ্ঞ মানুষদের; তাদের ছদ্ম-দরদ দেখিয়ে বলেন— আপনাদের কথা একটু বলুন। অর্থাৎ যারা নিম্নবর্ণ থেকে আসছেন, তারাই তাদের সমস্যা নিয়ে কথা বলুন। মুসলমান মহিলা হলে মুসলমান মহিলার সমস্যা নিয়ে কথা বলাই তার কাজ? নাকি সামগ্রিক ভাবে মহিলার সমস্যা নিয়েও তিনি বলবেন? মানুষ হিসাবে তার কি নিজস্ব কিছু বলার নেই? এই দৃষ্টিভঙ্গি বিপজ্জনক। সমরসতা বলা সোজা— মানসিক ভাবে বর্ণাভিমান ভুলে যথার্থ সমরসতার ভাব আয়ত্ত করা কঠিন।

ভারতে জাতিভেদ অত্যন্ত জটিল রূপ

ঝাড়ফুঁকের কাজ চলছে।

Sresth Products Private Ltd.

Regd. Off.-
49, Strand Road, Kolkata-700 007

Admn. Off. -
67/50, Strand Road, Kolkata-700 007

AJAY APPARELS

Office :
155B, Rabindra Sarani
3rd Floor,
Kolkata-700007
Ph. 033-2272 7030

EPC Electrical Pvt. Ltd.

17A, Tollygunge Road
Kolkata - 700 033
Phone :- 24241240/ 7108, E-mail : epc@epcfans.com

Manufacturer of TEMPEST Fans

QUALITY CERTIFIED BY - ISO 9002

নিয়েছে। বছর পঁচিশ আগে অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর জেলার সুঙ্গুর গ্রামে ছোটজাত মাদিগারা অত্যাচারিত হয়েছেন রাও-রেড্ডিদের কাছে। ঘটনার সূত্রপাত একটি ভিডিও পার্লারে। কয়েকটি মাদিগা যুবক টিকিট কেটে সিনেমা দেখছিলেন। পা লেগে যায় সামনে বসা উঁচু জাতের গায়ে। এনিয়ে তীব্র সংঘাত সংঘর্ষ শুরু হয়। আধুনিকতার দাবি হলো টিকিট কেটে সিনেমা দেখার অধিকার সকলের আছে। চিরাচরিত সংস্কারে আচ্ছন্ন মন বলবে, তা হোক, স্ববর্ণের গায়ে পা তুলে দেওয়া মানা সম্ভব নয়। ভারত জুড়ে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির টানা পোড়েনে দলিত আন্দোলনের পটভূমি গড়ে উঠেছে। এর দুতিনটে উৎস আছে।

গত শতাব্দীর প্রথম দিকে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে গড়ে ওঠে 'জাস্টিস পার্টি'। খ্রিস্টান মিশনের গোপন সাহায্যে এই আন্দোলন গড়ে ওঠে। দ্রুত জনপ্রিয় হয়। ১৯৩৫ সাল নাগাদ ই ভি রামস্বামী পেরিয়ার কংগ্রেসে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারির ক্ষমতা কেন্দ্রকে চ্যালেঞ্জ জানানোর পর বোঝেন কংগ্রেসে উত্তর ভারতের প্রাধান্য, বর্ণ হিন্দুদের প্রাধান্য এড়ানোর উপায় নেই। তিনি আরম্ভ করেন দ্রাবিড়-অস্মিতার আন্দোলন। 'দ্রাবিড়-কাঝাগাম' নামক সংগঠন দ্রুত জনপ্রিয় হয়। রামায়ণ-সহ সমস্ত পুরাণ সম্পর্কে সংস্কৃত ও হিন্দীর আধিপত্য সম্পর্কে এই আন্দোলন ক্রমেই জাতি সংঘাতে পরিণত হয়। দলিত সমাজ— মালা-মাদিগা-আদিরা অবশ্য এর মধ্যে কিছুমাত্র সুযোগ পাননি। চেটিয়ার-বানিয়ার-আন্না-রেড্ডি প্রভৃতি মধ্যস্তরের জাতিগোষ্ঠী ক্রমশ দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন।

মহারাষ্ট্রে গড়ে ওঠে অ-ব্রাহ্মণ আন্দোলন। এর সুচনা ঘটান জ্যোতিরাও ফুলে। তিনি ১৮৭২-এ প্রকাশ করেন 'গোলামগিরি'। এতে জ্যোতিবা আর ঠাণ্ডিবার কথোপকথনে ভারতে 'বহিরাগত' ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে অমার্জিত তীব্র আক্রমণ করা হয়। জ্যোতিরাও ছিলেন মালি

ডোকরা শিল্পী।

সম্প্রদায়ের মানুষ। একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে যাবার পথে তিনি তীব্র অপমানিত হন। পেশোয়াদের শাসন তখন নেই, অথচ ব্রাহ্মণ বরযাত্রীরা তাঁর ব্রাহ্মণের মতো সাজপোষাক দেখে তীব্র অপমান করেন। তখন মহারাষ্ট্রে অস্পৃশ্য মাহারদের উপর অত্যাচার ছিল সীমাহীন। জ্যোতিরাও মাহারদের মধ্যে কাজকর্ম করতে থাকেন। গড়ে তোলেন 'সত্যশোধক সমাজ'। ভারত ইতিহাস সংস্কৃতি ব্রাহ্মণ্য ভাবধারায় কলুষিত-অসত্য-অমানবিক হয়ে গেছে! এই জন্য সত্য শোধিত করতে তিনি ওই সমাজ গড়লেন।

ড. বি আর আম্বেদকর জ্যোতিরাও ফুলেকে দেখেননি। তবে তিনি বিভিন্ন রচনায় তাঁকে তাঁর গুরু বলে ধরেছেন। ড. আম্বেদকর গড়ে তোলেন সর্বভারতীয় অস্পৃশ্য অবর্ণ সমূহের মঞ্চ। আজকের ভারতের দলিত আন্দোলন তাঁর সিডিউলড কাস্ট ফেডারেশনের উত্তরাধিকার বলে ধরতে হয়।

স্বাধীনতার আরও পরে ড. আম্বেদকর বিপুল জনসমর্থনের সম্ভাবনা ব্যবহার করেছেন। এনিয়ে গাণিতিক সত্য হয়তো তাঁকে সাহায্য করেছে, কিন্তু খাতায় কলমে ছোট জাতদের সংখ্যা মিলিয়ে অঙ্ক কষে যা বিপুল মনে হয়, তা কার্যত একটি সংখ্যা মাত্র। ভারতে নানা প্রান্তে নানা বাস্তবতা, নানা সংস্কৃতি, নানান ভেদ-বিভেদ। যাই হোক ড. আম্বেদকর যোগ্য, শিক্ষিত, পারঙ্গম মডারেট আধুনিক নেতা হওয়ায় তিনি সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে তাঁর আকাঙ্ক্ষা জুড়ে দিয়েছেন।

সংবিধানে অনগ্রসর সমাজের জন্য কমিশন গঠনের কথা যোজিত আছে। ১৯৫৫-তে 'কাকা সালেশকার কমিশন' গঠিত হয়। জওহরলাল নেহরু সেই কমিশন ঠাণ্ডা ঘরে ঢুকিয়ে দেন। পরে গঠিত হয় বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ মণ্ডল তথা বি.পি. মণ্ডল কমিশন। সেটির সুপারিশও কোনও সরকার লাগু করেননি। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ ১৯৯২-এর আগস্টে হঠাৎ করে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ লাগু করলে ভারতব্যাপী দলিত আন্দোলন নতুন মাত্রা পায়। অনগ্রসর জাতি গোষ্ঠীগুলি পরস্পরের মুখোমুখি রণংদেহি রূপে ময়দানে নেমে পড়েন। একটি উদাহরণ দিই। 'অজগর' ছিল সাংবাদিকদের দৃষ্টিতে একটি বিচিত্র রাজনৈতিক সমীকরণ। আহির = A, জাঠ = J, গুর্জর=G আর রাজপুত = R। মণ্ডল কমিশন লাগু হওয়ায় এই চার গোষ্ঠীর মধ্যে সমীকরণ ভেঙে গেল। কারণ জাঠ-রাজপুতরা ও বি সি নয়, আর আহির-গুর্জররা ও বি সি! বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ অনগ্রসর সমাজের উন্নয়নের জন্য মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ লাগু করেছেন— একথা অচিরেই মিথ্যা প্রমাণিত হলো। সমাজে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সংঘাত বরং আরও

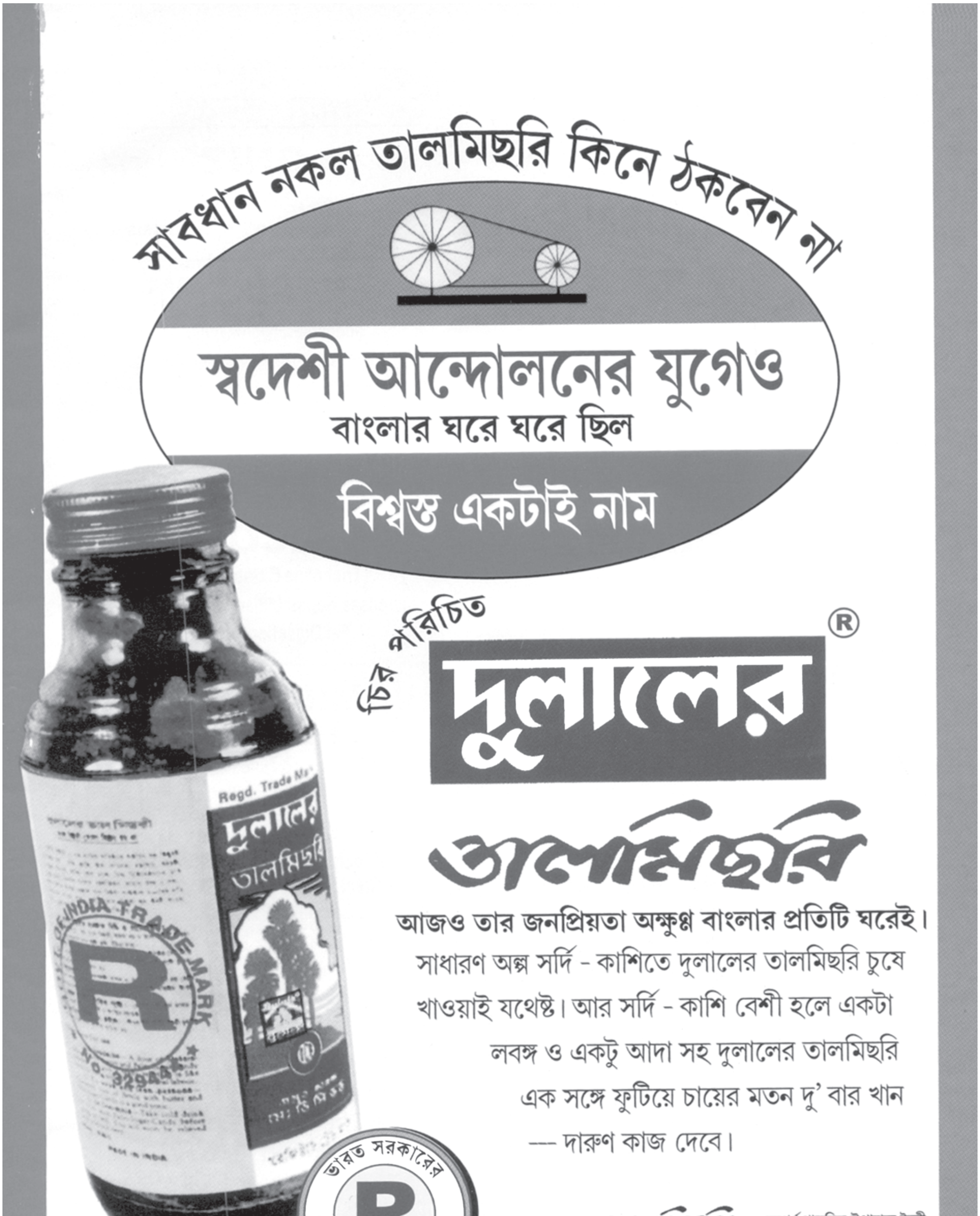

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না
স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম
চির পরিচিত
দুলালের ®
তালমিছরি
আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
--- দারুণ কাজ দেবে।
ভারত সরকারের R চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন
দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী
Regd. Trade Mark
দুলালের তালমিছরি
R
দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

বৃদ্ধি পেল।

বি পি মণ্ডলের উক্ত কমিশনের সব চেয়ে বিপজ্জনক দিক হলো মুসলমান সমাজের মধ্যে অনগ্রসর গোষ্ঠী আবিষ্কার আর তাদের জন্য সংরক্ষণের সুপারিশ। এটি অবান্তর অযৌক্তিক বিষয়। সংবিধানের মূল সুর হিন্দু সমাজের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে চেয়েছে। হিন্দু সমাজে বর্ণ ব্যবস্থার বিকৃতি মধ্যযুগে জাতপাতের মধ্য দিয়ে প্রকট হয়েছে। সুতরাং সংরক্ষণের মাধ্যমে বঞ্চিত অংশকে সুযোগ প্রদানের দাবি ব্রিটিশ শাসকদের সময়ই উঠেছে। হিন্দু সমাজের অসাম্য দূর করাই এর প্রাথমিক ও শেষ লক্ষ্য। যারা অসাম্য মানেননি তারা 'উদার' 'সাম্যবাদী' ইসলাম কবুল করেছেন, খ্রিস্টান হয়েছেন— অন্তত এই দাবি তো চিরন্তর। সুতরাং অন্য ধর্মাবলম্বীরা কেন সংরক্ষণের সুযোগ পাবেন? মণ্ডল কমিশন কিন্তু এই সহজ যুক্তি মানেনি। হিন্দু সমাজকে ভাঙার পাশাপাশি এই কমিশন ভারতীয় সমাজকে ভেঙেছে। অনগ্রসরদের মধ্যে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের গণনা করে অনগ্রসরদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের সমান্তরাল একটি পৃথক সভা তৈরি করার হীন ষড়যন্ত্র হলো মণ্ডল কমিশন। আর একে হাতিয়ার করে পশ্চিমবঙ্গের মতো আড়ালে হিন্দু-বিরোধী সরকারগুলি মুসলমানদের প্রায় সকলকেই অনগ্রসর হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এই বিপজ্জনক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে হিন্দু অনগ্রসররা কার্যকর কোনও আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি।

জাতকে উত্তর ভারতে তিনটি প্রধান সংকেত-দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। সংকেত অর্থাৎ indicator. রোটি বেটি আর কাম। এক সঙ্গে খাওয়া— রোটি, বিবাহ সম্পর্ক— বেটি আর একই রকম পেশা— কাম। এ থেকে গড়ে ওঠে বিচ্ছিন্নতা। সমাজ জীবনে আধুনিক সাম্য আসে না। কূট রাজনীতি এই বিভেদকে তাদের শক্তি সমন্বয়ের উপায় হিসাবে ব্যবহার করছে। কাঁশিরাম— এই কৌশলের প্রবক্তা। তিনি ডি-এস ৪ (দলিত শোষিত সংঘর্ষ সমিতি) আর বামসেফ (ব্যাকওয়ার্ড- মাইনরিটি-এসসি-এসটি-স্টাফ ফেডারেশন) গড়ে তোলেন। কাশিরাম ছিলেন সামরিক বাহিনীর বিজ্ঞান শাখার আধিকারিক। বুদ্ধিমান মানুষ— পঞ্জাবের আদিধর্মী, সপ্রতিভ। তবে বুদ্ধির অপপ্রয়োগ ঘটিয়েছেন। ক্রমে তিনি গড়েন বহুজন সমাজ পার্টি। বহুজন শব্দটি বুদ্ধদেবের ধর্ম প্রচারে ব্যবহৃত হয়েছে। বহুজন সুখায় বহুজন হিতায় তাঁর ধর্ম। কাশিরাম শব্দটি ভারতের মূল অধিবাসী অর্থে প্রয়োগ করেছেন। তাঁর মতে, এদেশে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র দেশের মূল অধিবাসীদের ভাগ করে শাসন করছে। তাই বহুজন সমাজের পুনর্গঠন বলতে ব্রাহ্মণ ও তাদের সমর্থক মুষ্টিমেয় স্ববর্ণের বিরুদ্ধে এক বৃহৎ গণজোট। বলা বাহুল্য, এই ভাবনার ভিতরে কোনও ইতিহাসের সমর্থন নেই— ওই নিছক সামাজিক-পুনর্গঠনের অপপ্রয়োগ। ৮৫ শতাংশ মানুষকে বহুজন বলে তাড়িয়ে শাসন ক্ষমতা দখলের চেষ্টা সাময়িক সাফল্য পেয়েছে। আর অযৌক্তিক জোট গড়লে যা হয়, কাঁশিরামের হাতে তৈরি মায়াবতী হলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। কাঁশিরাম গৃহবন্দি হলেন, রহস্যময় পরিস্থিতিতে মারা গেলেন। উত্তরপ্রদেশে কখনো অনগ্রসর যাদবদের বিরুদ্ধে দলিত-মুসলমান ঐক্য কখনো এমনকী দুয়েকজন ব্রাহ্মণকে দলে নিয়ে ট্রাপিজের খেলা চলল। বহুজন সমাজের স্বপ্ন মায়া মতিভ্রম হলো। তৈরি হলো পার্ক। নিজেই নিজের মূর্তিতে মালা দিয়ে হাতির মতো হাসতে থাকলেন এক তৃপ্ত মহিলা।

ভারতে এমন বিচিত্র রাজনীতির তুলনা দক্ষিণে পূর্বে দেখা গেল অবশ্য। তবে টাকার মালাপরা এমন বহুজন-হাসির কোনও তুলনা ভূ-ভারতে নেই।

ইড়পালা গ্রামের এক ভদ্রলোকের প্রদত্ত জমিতে গড়ে উঠেছে রামকৃষ্ণ মিশন। তাদের বার্ষিক উৎসবে এবছরও অন্ন-মহোৎসবের ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের ঘটনা এবছর অন্ন-ভোগ গ্রহণের লোকজন আশ্চর্যভাবে কমে গেছেন। মহারাজ সকল গ্রামবাসীকে

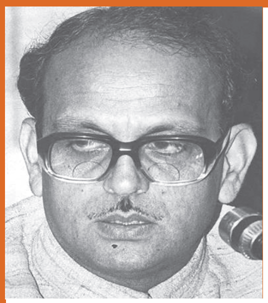
ভি পি সিংহ

মায়াবতী

হার্দিক প্যাটেল

কাঁশীরাম

বিশেষ উপায়ে ভোগবন্টনে বাধ্য হয়েছেন। সমাজের নিচু তলায় মুসলমানদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে— বিবাহ সম্পর্ক আগে গোপন ছিল এখন প্রকাশ্য হয়েছে। নদীর ওপারের ভাটিখানা সরে এসেছে। মাঝে মাঝেই খ্রিস্টিয় ব্যবস্থা হচ্ছে। নিরামিষ অন্ন-মহোৎসবের প্রতি আগ্রহ কমেছে। গণবেশ পরে— বিজাতীয় ভাষায় সূর্যপ্রণাম নিশ্চয় ভারতীয় সংস্কারের আলো ছড়ানোর ব্যবস্থা, কিন্তু সমাজের তরঙ্গ বোঝা— সে তরঙ্গ থেকে সময়ানুগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিকল্পনা না থাকলে পশ্চিমবঙ্গের বিপদ আরও জটিল হবে। তখন নিচু জাতের মানুষদের এসো ভাই বলে ডাক দিলে তারা ভরসা করবেন কতটা জানি না। কারণ তাদের মধ্য থেকে যারা এই তরঙ্গভঙ্গ বুঝতে পারতেন— তাদের উপেক্ষা করে তাদের সমর্থন হয়তো মিলবে, কিন্তু এক সময় তারা ভাববেন, আমার যথার্থ সম্মান কিন্তু এই গণবেশ-সমাবেশেও নেই। ▮

বনবাসী-গিরিবাসী মানুষদের সংস্কৃতির রক্ষণাবেক্ষণে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম

সন্দীপ চক্রবর্তী

প্রাচীন ভারতবর্ষে অরণ্য ছিল সম্পদ। বন্য পশু এবং বনবাসী মানুষ, দুইয়েরই কদর ছিল। কবি বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে গুহক চণ্ডালের বন্ধুত্বের কথা লিখেছেন। মহাভারতেও আমরা ধীবররাজের কথা জানতে পারি। যার মেয়ে সত্যবতীর সঙ্গে মহারাজ শান্তনুর বিবাহ হয়েছিল। তা ছাড়া, ঋষিদের কথাই বা কীভাবে ভোলা সম্ভব। প্রাচীন ভারতের ঋষিরা তপস্যার জন্য অরণ্যের শান্ত সৌম্য পরিবেশকে বেছে নিতেন।

অবস্থার পরিবর্তন ঘটল দীর্ঘ ইসলামি শাসনে। তারপর ব্রিটিশ আমলে। মুসলমানের তরবারির ভয়ে এবং মেকলে-প্রবর্তিত শিক্ষানীতির কুপ্রভাবে সনাতন পেশাভিত্তিক বর্ণাশ্রম প্রথা বদলে গেল জাতপাতের ভেদাভেদে। মূলস্রোতের সমাজজীবনে বনবাসী-গিরিবাসী মানুষ হয়ে গেলেন ব্রাত্য। তাদের জন্য সরকারের কোনও উন্নয়ন কর্মসূচি নেই, শিক্ষা নেই। স্বাস্থ্য পরিষেবায় তারা কয়েকশো বছর পিছিয়ে। আছে শুধু প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সরকার, রাজনীতির কারবারি আর ধ্বংসকামী নগর সভ্যতার কুশীলবদের হাতে নিপীড়িত হবার ইতিহাস।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৫২ সালে পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের জন্ম। সেই সময় ভারতে জনজাতি মানুষের সংখ্যা ছিল আট কোটি। মোট জনজাতির সংখ্যা ছিল ৪২৫টি এবং তারা ১৫০টি উপভাষায় কথা বলতেন। নিঃসন্দেহে এই সংখ্যা পরে আরও বেড়েছে। বনবাসী-গিরিবাসী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য ছত্তিশগড়ের যশপুর নগরে বনযোগী বালাসাহেব দেশপাণ্ডে প্রতিষ্ঠা করলেন বনবাসী কল্যাণ আশ্রম। ধীরে ধীরে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল কল্যাণ আশ্রমের দরদি স্পর্শ। এই মুহূর্তে তপশিলি জাতি, জনজাতি মানুষের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অবদানের বিচারে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম ভারতের বৃহত্তম সংগঠন। ব্রাত্যজনের সনাতন সংস্কৃতির রক্ষণাবেক্ষণে কল্যাণ আশ্রমের ভূমিকা এক কথায় অনবদ্য। প্রায় এগারোশো পূর্ণসময়ের কর্মী কল্যাণ আশ্রমে কাজ করেন। তাদের সাহায্য করেন হাজার-হাজার আংশিক সময়ের কর্মী।

সংগঠন তৈরি হওয়ার সময়েই তার কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট হয়ে যায়। স্পষ্ট হয়ে ওঠে সংগঠনের দর্শন। ভারতের লক্ষ লক্ষ বনবাসী-গিরিবাসী মানুষের সঙ্গে একাত্মতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম। উদ্দেশ্য, পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোকে বোঝানো যে তারাও মূলস্রোতের সমাজজীবনের অঙ্গ। যুগ যুগ ধরে এক সমৃদ্ধ কৃষ্টির ধারক ও বাহক হওয়া সত্ত্বেও আজকের বনবাসী যুবক-যুবতীরা সেই পরম্পরা থেকে দূরে সরে গেছেন। তাদের আবার ফিরিয়ে আনতে চায় কল্যাণ আশ্রম। শিকড়ে ফেরাতে পারলে তবেই তাঁরা নিজেদের আত্মপরিচয়, আত্মগৌরব এবং আত্মসম্মান রক্ষা করতে পারবেন। কল্যাণ আশ্রম চায়, বিদেশি অর্থ এবং ভাবধারায় পুষ্ট যে মাওবাদী আন্দোলন বনবাসী সমাজে দেশদ্রোহিতার বীজ বপনে সচেষ্ট তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সরল মানুষগুলোকে সচেতন করে তুলতে। সেইসঙ্গে দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটানোও কল্যাণ আশ্রমের উদ্দেশ্য। বনবাসী সমাজ যাতে নিজেদের উন্নতির জন্য কাজ করে তার জন্য আশ্রমের কর্মীরা সদাই সক্রিয়। কল্যাণ আশ্রম বনবাসী সমাজে একতা, সৌভ্রাতৃত্ব এবং সাম্যের বাতাবরণ

মহিলা শিক্ষাকেন্দ্র।

তৈরি করতে চায়। নগরবাসী এবং বনবাসীর মধ্যে কোনও বৈষম্য তাদের কাম্য নয়।

সভ্যতার মধ্যে ভারসাম্য আনার কাজ করছে কল্যাণ আশ্রম। তাদের কাজের পরিসংখ্যান দিলে অতি বড়ো করপোরেট ফার্মেরও চোখ কপালে উঠে যাবে। সারা দেশে আশ্রমের তত্ত্বাবধানে ছেলেদের ছাত্রাবাস রয়েছে ১৯১ টি। মেয়েদের ৪৮টি। প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯১ টি। শিশুশিক্ষা কেন্দ্র ৪, ৪৪৯টি। শিক্ষাপ্রকল্পে উপকৃত মানুষের সংখ্যা ১,৪১,৫৯৩ জন। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পরিসংখ্যান আরও উজ্জ্বল। আশ্রমের তত্ত্বাবধানে হাসপাতাল রয়েছে ২০৩টি। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা আরোগ্য রক্ষক চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে ৩,৯৫৭টি। প্রতি বছর ৫৭৯ টি চিকিৎসা শিবির করা হয়। বাচ্চাদের খেলাধুলার কেন্দ্র ২,৪৬১টি। চিকিৎসা প্রকল্পে উপকৃত ৬,০০,৫১৫ জন। কল্যাণ আশ্রমের কাজের আর একটি দিক মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলা। আশ্রমের নিজস্ব কৃষি প্রশিক্ষণ সংস্থা রয়েছে ৫১টি। কুটীর উদ্যোগ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৯৮টি। স্বয়ং সহায়তা কেন্দ্র ২,৮৮৫টি। গ্রাম বিকাশ প্রকল্প ৭৯টি। আর্থিক বিকাশ প্রকল্পে উপকৃত ৪৬,৬৯৯ জন। এর পাশাপাশি রয়েছে ৫,৭৭২টি শ্রদ্ধাজাগরণ কেন্দ্র, ৬৭০টি লোককলামণ্ডল এবং ৫২, ০৩৮টি বনবাসী গ্রাম।

বনবাসী মানুষ জানেন তাদের পাশে কল্যাণ আশ্রম আছে। স্বাধীনতার পর কংগ্রেস এবং বামপন্থীরা দলিতদের নিয়ে রাজনীতি করেছে। কল্যাণ আশ্রম 'দলিত' শব্দটাতেই বিশ্বাস করে না। তাদের কাছে সবাই মানুষ। যার ফলে বনবাসী যুবতী কলকাতার কলেজে পড়তে যায়। আবার বাড়ি ফিরে করোঞ্জের তেল মেখে স্নান করে খোঁপা বাঁধে। আর বনবাসী যুবক ইঞ্জিনিয়ার হয়েও ধামসা মাদল ছাড়ে না।

ক্রীড়াক্ষেত্রে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম

জনজাতি সমূহের খেলা বলে পরিচিত খেলার উন্নতিতে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। তিরন্দাজির কথা এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে। তিরন্দাজিতে জনজাতি এবং বনবাসী যুবক-যুবতীর দক্ষতা সেই রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকে বিখ্যাত। সহজাত এই দক্ষতাকে অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরও পরিশীলিত করার ভার নিয়েছে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম। প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের তিরধনুক কিনে দেওয়া থেকে শুরু করে তাদের জন্য সর্বক্ষণের প্রশিক্ষক নিযুক্ত করা পর্যন্ত সব দায়বদ্ধতাই পালন করছে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে শ্রীমতী মাধুরী আউতের কথা। তিনি পিরানঘাটের রানি লক্ষ্মীবাই মিলিটারি স্কুলের প্রশিক্ষক। কিন্তু বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কচিকাঁচাদের অনুরোধে তাদেরও প্রশিক্ষণ দেন। তার জন্য কোনও পারিশ্রমিক নেন না। সারা ভারতের অজস্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে উঠে এসেছেন একের পর এক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানের তীরন্দাজ। তাদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় লিম্বারামের। তিরন্দাজির এই কিংবদন্তীর জন্ম রাজস্থানের উদয়পুর জেলার সারাদিত গ্রামে। তিনি ১৯৯২ সালে বেজিং এশিয়াডে বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ করেছিলেন। ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনা তো পেয়েইছিলেন, তারই কৃতিত্বে সেবার ভারত তিরন্দাজিতে দলগত সোনাও দখল করেছিল। লিম্বারামের পরেই নাম করতে হয় কবিতা টুঙ্গারের। কবিতাও লিম্বারামের মতো বনবাসী সমাজের মানুষ এবং তার খেলাধুলোর চর্চা ও প্রশিক্ষণ বনবাসী কল্যাণ আশ্রমে। তবে কবিতা তিরন্দাজ নন, অ্যাথলিট। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ২০১০ কমনওয়েলথ গেমসে তিনি ট্রাক অ্যান্ড ফিল্ড বিভাগে সোনা জিতেছিলেন। ১৯৫৮ সালে কারডিফ কমনওয়েলথ গেমসে মিলখা সিংহ সোনা জেতার পর ট্রাক অ্যান্ড ফিল্ডে সোনার জন্য ভারতকে ৫০ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। রিতাকুমারী বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের আর এক অবদান। তিনিও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সফল। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম ভারতীয় ক্রীড়াজগতে ধাইমা'র ভূমিকায় অবতীর্ণ। ভবিষ্যতে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম আরও অনেক ক্রীড়ানক্ষত্রের জন্ম দেবে, এই আশা করাই যায়। ■

কল্যাণ আশ্রমের শিশুশিক্ষা কেন্দ্র।

R. K. WIRE PRODUCTS LTD.

Office : Unit No-VII, 15th floor, Tower-I
PS Srijan Corporate Park
Plot No. G-2, Block-EP & GP, Sector-V
Salt Lake City, Kolkata-700 091
(West Bengal) India

রাষ্ট্র নির্মাণে নতুন দিশা দিয়েছিলেন বাবাসাহেব আম্বেদকর

রমেশ পতঙ্গে

আজ সময় এসেছে ভারত রাষ্ট্র নির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁর যে বিরাট অবদান তাকে স্মরণ করার। তিনি প্রথম এই তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন যতক্ষণ না সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণী নিজেদের আত্মসম্মান নিয়ে উঠে দাঁড়াবে, ততক্ষণ সমগ্র জাতি কিছুতেই দাঁড়াতে পারবে না। একজন সাধারণ মানুষের আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মান সর্বদা থাকা দরকার। তারা প্রত্যেকেই সমাজ ও জাতির উন্নয়নে অবদান রাখবে। এই বিষয়টিকে স্মরণে রেখে বাবাসাহেবের অসাধারণ অবদানকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম হলো, তিনি নিজে সমাজ ও জাতির সেবায় কীভাবে জীবন কাটিয়ে ছিলেন। এবং দ্বিতীয়, তিনি জাতীয় একতা, উন্নতি, সম্পদ ও নিরাপত্তা নিয়ে কী ভেবেছিলেন। বাস্তবে তাঁর জীবন ছিল আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটা। দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণ করতে গেলে তাকে শিক্ষিত করে তোলাটা একান্ত প্রয়োজন, এটি ছিল তাঁরই মস্তিষ্ক প্রসূত ভাবনা। মনে রাখতে হবে তিনি যখন শিক্ষা গ্রহণের গুরুত্বের কথা বলছেন তখন তিনি নিছক জ্ঞান বিতরণ করছেন না। কেননা তিনি নিজে ছিলেন একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত। তাঁর অধীত ছিল এমএ, পিএইচডি, ডিএসসি, ব্যারিস্টার অব ল', এলএলডি ইত্যাদির দেশ বিদেশের মহার্ঘ সব ডিগ্রি। আমার ধারণায় সমাজের সর্বাপেক্ষা পতিত অবস্থানে থাকা মানুষটির মধ্যেও নিজেকে উন্নতির সোপানে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন ও বিশ্বাস জাগানোই ছিল বাবাসাহেবের জীবনের সেরা অবদান।

ভারতের হিন্দু সমাজের তথাকথিত নিম্ন বর্ণের মানুষদের কয়েক হাজার বছর ধরে ছিল না কোনও সাধারণ সামাজিক, নাগরিক বা রাজনৈতিক অধিকার। বস্তুত তারা এক ধরনের সামাজিক দাসত্বের জীবন যাপন করত। এই দাসত্বকে আরও বেশি কঠিন করে তুলেছিল ধর্মীয় অনুশাসনের বাড়াবাড়ি। ধর্মীয় বিধানের আওতায় এসে যাওয়ার ফলে তাদের এই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে পরিত্রাণের কোনও পথ ছিল না। বর্ণ ও ধর্ম উভয়ের সংমিশ্রণে এক ধরনের 'বৈজ্ঞানিক বৈষম্যের' কাঠামো খাড়া করা হয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাবাসাহেবের উত্থানের আগে এই নিম্ন বর্ণের সম্প্রদায় জানত না যে অস্পৃশ্যতা একটি সামাজিক পাপ।

আমাদের দেশ বারবার মুসলমান আক্রমণ ও বহু বিদেশি শাসকের অধীনস্থ হয়েছে। এই রাজনৈতিক দাসত্ব বিশেষ করে মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আগরকর, ভাণ্ডারকর, তেলাঙ্গ বা মহাত্মা ফুলের সময়ে একভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল, আবার ন্যায়াধীশ রানাডে, জি কে গোখলে বা তিলকের সময় ভিন্নভাবে বিশ্লেষিত হয়। কিন্তু বাবাসাহেবের বিশ্লেষণ ছিল এঁদের সকলের থেকে স্বতন্ত্র। তিনি বললেন, যদি এই তথাকথিত অস্পৃশ্যদের হাতে সময়মতো অস্ত্র তুলে দেওয়া হতো তাহলে দেশ আজ এভাবে পরাধীন হয়ে থাকত না। তথাকথিত নিম্ন বর্ণের সমাজে জন্মানো ব্যক্তি জাতীয় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায়--- আগ্রাসী মুসলমানদের শিকার হয়ে যায়। এই

সমাজের বড় সংখ্যা নিজেদের থেকে পরধর্ম গ্রহণ করে কেননা তারা কখনও বোঝার সুযোগই পায়নি যে, তাদেরও জাতির নির্মাণে একটা ভূমিকা আছে।

এই দীর্ঘ শতাব্দী ধরে মেনে নেওয়া অবমাননাকর পরিস্থিতিতে সেই সমস্ত মানুষদের অনুপ্রাণিত করে তাদের মধ্যে প্রতিবাদী মনোভাব জাগিয়ে এই সামাজিক দাসত্ব ভেঙে উত্তরণের পথ নির্দেশ দেওয়া আদৌ সহজ ছিল না। আর এই সামাজিক জাগরণের আবাহনই বাবা সাহেবের জাতীয় জীবনে অন্যতম অবদান। তাঁর বিশাল কর্মকাণ্ডকে সংক্ষিপ্তাকারে এই ভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। তিনি দীর্ঘদিন নির্যাতিত এই শ্রেণীকে প্রথমত তাদের অবস্থা নিয়ে সজাগ হতে বলেন। এর পরই তাদের বিদ্রোহের পথে উদ্বুদ্ধ করেন। তাদের মধ্যে সুপ্ত থাকা আত্মসম্মানের চেতনায় তিনি অগ্নিসংযোগ করেন। সম্মান ও মুল্যবোধ রক্ষা করে বাঁচা বা মরাই যে শ্রেয় এই তথাকথিত নিম্ন বর্ণের সমাজের মধ্যে এই উপলব্ধির জন্মদাতা ছিলেন তিনিই।

১৯২০ সালের আগে ভারতে কেউই সমাজের নিম্নবর্গের মানুষকে ও বর্ণের নিরিখে শেষ ধাপে থাকা ব্যক্তিকে জাতি গঠনের কাজে নিয়ে আসার কথা ধর্তব্যেই আনত না। আজ প্রায় ১০০ বছর পরে বিষয়টা বিরাটভাবে বদলে গেছে। আজ বঞ্চিত সমাজ থেকে উঠে এসে কেউ দেশের রাষ্ট্রপতি হতে পারেন। হতে পারেন রাজ্যপাল বা মুখ্যমন্ত্রী। নিম্নবর্গের থেকে অনেকেই শিক্ষা ক্ষেত্রে এখন সর্বোচ্চ পদে চলে যেতে পারেন। শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র, নাটক, অর্থনৈতিক সংস্থা থেকে বিদেশ বিভাগের চাকরি প্রভৃতি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই এই শ্রেণীর মানুষদের এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। রাষ্ট্র নির্মাণের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের তাৎপর্য কী? এই পরিবর্তনের সূচনা করতে কোটি কোটি অবহেলিত ও বঞ্চিত মানুষকে জাতীয় জীবনের মূল ধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ করে নিতে বাবাসাহেব যে পদ্ধতি নির্ধারণ করেছিলেন তা অমূল্য। যখন আমাদের দেশে এক বিদেশি শাসকের রাজত্ব কায়েম ছিল সেই সময় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিতে আন্দোলন চলছিল। সমাজের বহু অংশ যেমন তথাকথিত অস্পৃশ্যরা, যাযাবর সম্প্রদায়, বনবাসী বা অন্যান্য পিছিয়ে পড়া মানুষজন পূর্বোল্লেখিত সামাজিক দাসত্বের জীবন কাটাচ্ছিল। বাবাসাহেব প্রথম তাদের এই সামাজিক বন্ধনদশা থেকে মুক্তির জন্য আন্দোলন শুরু করলেন। এই সূত্রে তিনি কি যুক্তি তুলে ধরেছিলেন তা তাঁর বিখ্যাত 'Annihilation of Caste' সংক্রান্ত বক্তৃতায় পাওয়া যায়।

(১) হিন্দু সমাজের প্রকৃতি ক্রমাগতই বেড়ে চলা সামাজিক বৈষম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

(২) মানুষের বর্ণ তার জন্মের সঙ্গেই নির্ধারিত হয়ে যায়, তার পরিবর্তন করা যায় না।

(৩) এই বর্ণ বিভাজনের ফলে শ্রম বিভাগ সৃষ্টি হয়েছে, ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়েছে।

(৪) বর্ণ বিভাজনের একটি অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাও আছে। যত খারাপ ও নোংরা ধরনের কাজ সেগুলি কেবলমাত্র নিম্নবর্ণের লোকদেরই বরাদ্দ করা হয়।

(৫) নিজেদের ব্যবসা করার কোনও স্বাধীনতা তাদের ছিল না।

(৬) এই সমস্ত প্রথাকে মান্যতা দিতে একটি ধর্মীয় অনুমোদন সব সময়ই দেওয়া থাকত।

(৭) এ থেকে বোঝা যায় বর্ণাশ্রম হচ্ছে দৈব নির্দেশিত আর তার ফল কখনই পরিবর্তন যোগ্য নয়।

এই প্রসঙ্গে বাবাসাহেব একবার তৎকালীন কংগ্রেস নেতাদের সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন যে, আপনারা তো রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবি জানাচ্ছেন। কিন্তু আমাদের অধিকার ও স্বাধীনতার কী হবে। বাবাসাহেবের চোখে গান্ধীর নেতৃত্বে চলা কংগ্রেস ছিল হিন্দুদের দল। মহাত্মা নিজে ছিলেন একজন সনাতনী হিন্দু। চতুর্বর্ণের ভাগ ও জাত ভিত্তিক ব্যবসা গান্ধীর কাছে গ্রহণীয় ছিল। অবশ্যই তার মানে এই নয় যে অস্পৃশ্যতাকে গান্ধী স্বীকার করতেন। গান্ধী তাঁর নিজের মতো করে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন। কিন্তু সে পথ বাবাসাহেবের কাছে ঠিক গ্রহণীয় বলে মনে হয়নি। তাঁর বিরোধিতা ছিল নীতিগত অবস্থান নিয়ে। তিনি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছিলেন— যদি আমরা সমান অধিকারের ভিত্তিতে একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই সেক্ষেত্রে বর্ণাশ্রমকে মেনে নেওয়া, জাতভিত্তিক ব্যবসা নির্দিষ্ট করে দেওয়া কখনই একসঙ্গে চলতে পারে না।

বাবাসাহেব নিজে তাঁর জীবনে বহুবার সামাজিক দাসত্বের শিকার হয়েছেন। তৎকালীন সময়ে সর্বোচ্চ বিদ্বান ব্যক্তি হয়েও তিনি জাতভিত্তিক যে বৈষম্যের বলি হয়েছেন সেই নিরিখে তিনি যে ব্যক্তি সুদূর গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা, অর্থ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাহীন অবস্থায় রয়েছে তাকে কী দুরবস্থার মুখোমুখি হতে হবে— এই বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্বের নয় কিনা সেই প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাদের এই যন্ত্রণার উপশমের ভার কে নেবে? মহাত্মা গান্ধীকে এই বিষয়ে দলিতদের দুর্দশার কথা বোঝাতে বলেছিলেন, ''আমার নিজের মাতৃভূমি বলতে কিছু নেই।''

বাবাসাহেব আম্বেদকর সামাজিক স্বাধীনতার জন্য যে বিরাট লড়াই শুরু করেছিলেন তাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে গেলে আমাদের সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে নজর ফেরাতে হবে। ১৮৬০ সাল নাগাদ সমগ্র আমেরিকায় ৪০ লক্ষ দাস মানুষ বসবাস করত। সেই সময় উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে এই দাস প্রথা নিয়ে বড় সড় গৃহযুদ্ধ বেঁধে যায়। আমেরিকার মাটিতে এটিই ছিল সর্বাপেক্ষা বড় লড়াই। প্রায় ৬ লক্ষ ২০ হাজার মার্কিন সৈন্য গৃহযুদ্ধে মারা যায়। প্রায় সমসংখ্যক আহত হয়। প্রায় ১৩ লক্ষ লোকের ওপর যুদ্ধের প্রভাব পড়ে।

মনে রাখা দরকার, ফরাসি বিপ্লবের সময় রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়াই ছিল মূল বিষয়। এই গৃহযুদ্ধও কিন্তু মার্কিন গৃহযুদ্ধের থেকে হিংস্রতায় কোনও অংশে কম ছিল না। ফ্রান্স যে দেশটি আয়তনে আমাদের যে কোনও রাজ্যের মাপের হতে পারে সেখানে যুদ্ধের কারণে ১৭৯৩-৯৪ সালে ৫০ হাজার মানুষের মৃত্যু

হয়। 'স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী' এই তিন আরাধ্যকে প্রতিষ্ঠা করতে ছোট্ট দেশটিকে বড় মূল্য চোকাতে হয়।

ইতিহাসের নানা পদচিহ্ন পর্যালোচনা করে বাবাসাহেব ভারতে জারি থাকা অস্পৃশ্যতাকে তৎকালীন রোমের দাস ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করলেন। একই সঙ্গে মার্কিন দেশের কালো মানুষদের দাসত্বের সঙ্গেও আমাদের অস্পৃশ্যতার তুলনা টানলেন। অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্যভাবে তিনি বোঝালেন শুধু নয় প্রমাণ করলেন যে, এই দুটি দেশের থেকেও ভারতে চলতে থাকা দাসত্ব কত বেশি ভয়ঙ্কর। "if a slave becomes aware of his slavery, he would revolt।" বাবাসাহেবের এই বাক্যটি খুবই পরিচিত। বাবাসাহেব তাদের এই অচেতন অবস্থা থেকে জাগিয়ে তাদের নিজেদের অধিকার অর্জনের সংগ্রামে নামলেন। আর কী এক জাদুমন্ত্রে এ লড়াইয়ে কোনও হিংস্রতা দেখা গেল না। ১৯২৭ সালে মহারাষ্ট্রের মাহাদ অঞ্চলে সত্যাগ্রহীদের একটি তাঁবু বর্ণহিন্দুদের দ্বারা আক্রান্ত হবার খবর এল। সত্যাগ্রহীরা অনায়াসে আক্রমণকারীদের ওপর বলপ্রয়োগ করতে পারত। কিন্তু বাবাসাহেবের নির্দেশ অনুযায়ী তারা হিংসার পথ পরিহার করেছিল। আম্বেদকর দেশের মধ্যে এক অহিংস সামাজিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্যই হিংসার প্রকাশ দেখা দিলেও এই লড়াইয়ে প্রাণ সংশয় হবার মতো কোনও ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে বাবাসাহেব আম্বেদকর।

বাবাসাহেবের এই সামাজিক স্বাধীনতা আন্দোলনের আরও একটি লক্ষণীয় দিক আছে। পূর্বোল্লেখিত মাহাদ অঞ্চলে বর্ণ হিন্দুদের দ্বারা সত্যাগ্রহীদের ওপর যে আক্রমণ সংঘটিত হয়েছিল, সেই সত্যাগ্রহীদের মধ্যে মহারাষ্ট্রের চিত্রে, সহস্রবুদ্ধে, টিপনিস প্রভৃতি পদবিধারীরাও ছিলেন যারা আদতে বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের। বাবাসাহেব পরিচালিত বেশ কিছু সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ব্রাহ্মণদের সক্রিয় অংশগ্রহণও বাদ পড়েনি। আম্বেদকরের বিদ্যালয় জীবনে একজন ব্রাহ্মণ শিক্ষকের কথা তিনি বলেছেন, যিনি প্রায়শই তাঁর নিজের টিফিন থেকে বাবাসাহেবকে খাওয়াতেন।

বাবাসাহেবের উপলব্ধি ছিল, যে মানুষ মাতৃসম পূর্ণ নিষ্ঠায়, স্নেহে ও যত্নে সমাজের সেবা করেন একই সঙ্গে একজন পিতার শৃঙ্খলায় ও একজন শিক্ষকের জ্ঞানে সমাজকে সমৃদ্ধ করতে পারেন তিনিই সমাজে সর্বাপেক্ষা বেশি স্বীকৃতি পান। বাবাসাহেব তাঁর জীবদ্দশায় এই স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন। তাঁকে তদানীন্তন বম্বে প্রদেশের বিধানসভায় পাঠানোর জন্য সুপারিশ করেন স্বয়ং বল্লভভাই প্যাটেল। মহাত্মা গান্ধীর আগ্রহে তাঁকে দেশের সংবিধানের খসড়া তৈরিতে আহ্বান করা হয়। তখন Constituent Assembly-তে গরিষ্ঠাংশ সদস্য ছিলেন বর্ণহিন্দু। তাঁরা সকলেই কিন্তু বাবাসাহেবের কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছিল। এ থেকেই পরিষ্কার প্রমাণ হয় তাঁর নেতৃত্বে সামাজিক বিপ্লব নিশ্চিতভাবে সফল হয়েছিল।

বাবাসাহেবের পাবলিক লাইফকে মোটামুটি চারটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম জনকর্মসূচির মধ্যে ছিল একটি নির্দিষ্ট চিন্তার বিস্তার ও সেই ভিত্তিতে কর্ম পরিচালনা। উদাহরণ স্বরূপ মাহাদ সত্যাগ্রহ, নাসিকের কালরাস অঞ্চলে মন্দিরে দলিতদের প্রবেশাধিকার নিয়ে আন্দোলন, একই উদ্দেশ্যে পুণের পার্বতী এলাকায় আন্দোলন, গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান, সাইমন কমিশনের সামনে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপস্থাপনা ও পুণে চুক্তি সম্পন্ন করা এই পর্বের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই পর্বে বাবাসাহেব যে আদর্শগত অবস্থান নিয়েছিলেন তার মূল লক্ষ্য ছিল অস্পৃশ্যতা তুলে দেওয়া, হিন্দু সমাজ থেকে বর্ণভেদ প্রথার অবলুপ্তি ও সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তৎকালীন সমাজকে পুনর্গঠন করা। সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়াকালীন তিনি একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন "Declaration for the rights of all Hindus"। এই সূত্রে সাইমন কমিশনে অংশ নেওয়াকালীন তিনি কিছু তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন, "We are not part of Hindu Society. You can call us protestant Hindus or non- conformist Hindus" তাঁর এই নিদারুণ অভিমানী বক্তব্যের যথার্থ অনুধাবন দরকার।

তাঁর কর্ম জীবনের দ্বিতীয় পর্ব ছিল ১৯৩৫-১৯৪৭। ১৯৩৫ সালে ইয়োলাতে তিনি সেই এসপার ওসপারের ঘোষণাটি করলেন। "I am born as a Hindu but will not die as a Hindu"। এই সময়েই তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করে Independent Labour Party তৈরি করেন। আবার সময়ের প্রয়োজনে ১৯৪২ সালে এই দল ভেঙে দিয়ে তিনি সরাসরি সিডিউল কাস্ট ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ই ভারতের স্বাধীনতার লগ্ন এগিয়ে

আসছিল। বিলেত থেকে ক্রিপস মিশন এসে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছে। সেই ভিত্তিতে হবু স্বাধীন দেশের একটি উপযুক্ত সংবিধান রচনা করার প্রক্রিয়া শুরু হলো। মুসলমানদের জন্য ভারত ভাগ করে একটি নতুন দেশের জন্ম দেওয়া ঠিক হলো অর্থাৎ পাকিস্তান। হিন্দুদের জন্য যে খণ্ডাংশ পড়ে রইল তাই বিভক্ত ভারত। এই দেশভাগের প্রসঙ্গেও বাবাসাহেবের নিজস্ব মতামত ছিল।

দেশের অভ্যন্তরে এই দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পটভূমিতেই বাবাসাহেব উল্লেখিত এসসিএফ-এর প্রতিষ্ঠা করেন। প্রস্তাবিত Constituent Assembly-তে তপশিলি জাতির অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে গেলে তপশিলিদের নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠন না করলে প্রতিনিধি পাঠানো সম্ভব ছিল না। এই সূত্রে নাগপুরে All India depressed class-এর এক বিরাট সম্মেলন আয়োজিত হয়, যেখানে ৭০ হাজার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে তিনটি সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়। মুসলমান বা অন্যান্য সংখ্যালঘুদের জন্য রাজনৈতিক ও অন্যান্য অধিকার সুনিশ্চিত করার যেমন ব্যবস্থা আছে, তপশিলি জাতিদের জন্যও ঠিক তেমনি সর্বস্তরে আলাদা প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা রাখা ছিল অন্যতম গৃহীত সিদ্ধান্ত।

এরপর বাবাসাহেবের জীবনের তৃতীয় পর্ব, যেখানে তিনি সংবিধানের রূপকার হিসেবে তাঁর সমগ্র প্রতিভা উজাড় করে দেন। চতুর্থ পর্ব ছিল ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৬ সাল। রাষ্ট্র সংক্রান্ত চিন্তার অন্তর্গত হলো দেশের মানুষ, ভূমি, তার সংস্কৃতি-সহ আরও বহু কিছু। এই ক্ষেত্রে দেশের জনগণের আদি অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তার ক্ষেত্রে ভারতে আর্য জাতির অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত তত্ত্বকে তিনি নস্যাৎ করে দেন। এই মর্মে তিনি একটি বই লেখেন 'Who Were Sudras'। বাবাসাহেব 'ঋক বেদের' উল্লেখ করে বলেন সেখানে দু'টি শব্দ আছে 'Ary' অর্য ও Arya আর্য। এর মধ্যে অর্য শব্দটি ঋক বেদে ৮৮ বার লিখিত হয়েছে। শব্দটি কখনও (১) শত্রু (২) সম্মানীয় ব্যক্তি (৩) কোনও দেশের নাম এবং (৪) মালিক বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যদিকে Arya আর্য শব্দটি ৩১ বার ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু কখনই কোনও বর্ণ বা জাতি সংক্রান্ত কিছুর অর্থ হিসেবে নয়। এর অর্থ হলো আর্য কোনও জাতির নাম নয়। এরই পরিপূরক হিসেবে তিনি বাল গঙ্গাধর তিলকের Arctic সাগর অঞ্চল থেকে আর্যদের ভারতের আগমনের তত্ত্বকেও বাতিল বলে ঘোষণা করেন। বাবাসাহেব বিশদে বলেন, ঘোড়া আর্যদের অত্যন্ত পছন্দের পশু ছিল অথচ তাদের আদি দেশ Arctic অঞ্চলে ঘোড়ার কোনও চিহ্ন বা উল্লেখ পাওয়া যায় না। তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বৈদিক আর্যদের আদি বাসভূমি ছিল এই ভারত, এ সংক্রান্ত অজস্র প্রমাণ বৈদিক সাহিত্যে ছড়িয়ে রয়েছে। বাবাসাহেবের এই পর্যবেক্ষণ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের চরিত্র নির্ধারণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

বর্ণ প্রসঙ্গে বাবাসাহেবের মতামত যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে। এই বিষয়টি তিনি তাঁর 'Caste in India' গ্রন্থে বিশদে লিখেছেন। হিন্দু সমাজ যে বহু বর্গ ও বর্ণে বিভক্ত এ সত্যকে অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও ''We all are tied by a thread of same culture'' শত বিভাজনেও আমরা কিন্তু একই সাংস্কৃতিক সূত্রে বাঁধা। পূর্বোল্লেখিত গান্ধীর সঙ্গে অস্পৃশ্যতা নিয়ে দ্বিমত থাকায় তিনি দলিতদের স্বার্থে যখন বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করলেন তখনও কিন্তু গান্ধীকে বলেছিলেন, ''বৌদ্ধ ধর্ম ভারতীয় সংস্কৃতিরই একরকম অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ, তাই আমি সদাই সচেতন থাকব যাতে আমার এই পরিবর্তন কোনও ভাবেই এই দেশের রীতি, সংস্কার ও ইতিহাসকে বিঘ্নিত না করে।'' যদিও তিনি না ছিলেন অধার্মিক, না ছিলেন নাস্তিক। বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের পর বিখ্যাত দীক্ষাভূমিতে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন খাদ্য যেমন মানুষের জীবন ধারণ করে রাখে ধর্ম তেমনি মানুষের মনে আশার আলো প্রজ্বলিত রাখে। এ সম্পর্কে Bhagwan Buddha & his Dhamma গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করেছেন। যার সারাৎসার হলো ধর্মই মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের অবস্থানকে নিয়ন্ত্রণ করে। ভারতীয় রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদ ধর্ম ছাড়া সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে যখন হিন্দু কোড বিল নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হলো তখন বাবাসাহেব সরাসরি বললেন, কেনই বা কেবল হিন্দুদের জন্য আলাদা বিল হবে? একই দেশে যেখানে মুসলমান, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ সকলেই বসবাস করছে, সেখানে কেন সকলের জন্য অভিন্ন দেওয়ানী বিধি হবে না? দেশের মধ্যে অন্য ধর্মমতের অর্থাৎ মুসলমান ব্যক্তিগত আইন বা শরিয়ার তীব্র বিরোধী ছিলেন তিনি। কোনও ধর্মনিরপেক্ষ দেশে কোনও ব্যক্তিগত ধর্মভিত্তিক আইন থাকার প্রশ্নেরই বিরোধিতা করেছিলেন তিনি।

১৯৪২ থেকে ৪৬ সাল পর্যন্ত পরাধীন ভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ভাইসরয়ের মন্ত্রীসভায় তিনি আইনমন্ত্রী থাকার সঙ্গে জলসম্পদ মন্ত্রীও ছিলেন। দেশের সম্পদকে কীভাবে সংরক্ষণ করতে হয় তা নিয়ে তাঁর ছিল স্বচ্ছ ধারণা। তিনিই প্রথম দেশের নদীগুলির সংযোগের বিষয় তোলেন। হিরাকুঁদ বাঁধ তাঁরই মানস প্রকল্প। তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে তিনি বার বার বলেছেন গণতন্ত্র কেবলমাত্র রাজনৈতিক হাতিয়ার নয়। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে গেছেন— ''a form or method of Government (democracy) whereby revolutionary changes in the economic & social life of the people are brought about without bloodsheed''-এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভারত পেয়েছে।

স্বাধীনতার পর পূর্বতন ৫৬৫টি রাজন্যবর্গের অধীনে থাকা ছোট ছোট রাজ্যকে সর্দার প্যাটেল ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করে যথার্থ Nationstate গঠন করেন। বাবাসাহেব গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমগ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের পথে সংবিধান স্বীকৃতি গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার পথ বাতলে দিয়ে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

(লেখক বিবেক পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক)

অনুবাদক : সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

নববর্ষ ও হালখাতা
বাঙালির ঐতিহ্য

নন্দলাল ভট্টাচার্য

স্বাধীনতার মূল্য হিসেবে বাঙালি শুধু অর্ধেক বাংলাকে হারায়নি, সেই সঙ্গে প্রায় লোপাট হয়ে গেছে বাঙালির দিনপঞ্জি বা ক্যালেন্ডার। ইংরেজি সাল-মাস-তারিখ এখন জাঁকিয়ে বসেছে গড় বাঙালির জীবনে। তবে, এইভাবে সব কেড়ে নিলেও কাড়তে পারেনি বাঙালির নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখকে। সব ভোলার মধ্যেও পয়লা বৈশাখ প্রায় সকলেই হয়ে ওঠে আদ্যন্ত বাঙালি। বেশিরভাগ বাঙালি ব্যবসায়ী এই দিনই হালখাতার মধ্য দিয়ে শুরু করে ব্যবসার আর্থিক বছরের হিসেব-নিকেশ। তাই গ্রাম্য কবির কথায়,—

টাকডুম টাকডুম টাক
সব হারানো এই বাঙালির
বুকে বাজে নববর্ষের ঢাক।

সাবেকি পূর্ববঙ্গ, বর্তমানের বাংলাদেশে তো পয়লা বৈশাখ জাতীয় উৎসব। ইউনেসকো তো ২০১৬-তে দিনটিকে ঘোষণা করেছে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বা ঐতিহ্য দিবস। কিন্তু এই রাজ্যেও তো নববর্ষ ফিরিয়ে আনে তার অতীতকে। তার চিরন্তন ঐতিহ্যকে। তার নানা বৈশিষ্ট্যকে।

একদল পণ্ডিতের দাবি, পয়লা বৈশাখ নববর্ষের সূচনায় সাধারণ বাঙালি গৃহস্থের মধ্যে কোনও বিশেষ শাস্ত্রীয় বা লৌকিক উৎসবের প্রচলন নেই। যেসব স্মৃতি ও তিথি পালন গ্রন্থ বাঙালি হিন্দুর ধর্মীয় জীবনের নিয়ন্ত্রক, সেখানেও তেমন কোনও অনুষ্ঠান পালনের নির্দেশ নেই।

অন্য একদল পণ্ডিত বলেন, একবারেই তেমন কোনও নির্দেশ নেই তা নয়। তাছাড়া বাঙালির জীবনের প্রতিটি দিনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কোনও না কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান। পয়লা বৈশাখও তার ব্যতিক্রম নয়।

ব্যতিক্রম যে নয়, তা বোঝা যায় পঞ্জিকার উল্লেখ থেকে। পঞ্জিকার বহু সময়ই 'বচনের' কোনও আকর নির্দেশ না থাকায় অনেকে এগুলি অর্বাচীন বলে মনে করেন। কিন্তু সময়ের বিচারে তাও কিন্তু চলে আসছে শতকের পর শতক ধরে। তাই সেগুলির গুরুত্বকে একাবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

পয়লা বৈশাখে 'প্রাপ্তে তু নূতন বর্ষে প্রতি গৃহং কুর্যাৎ ধ্বজারোপণম্'—অর্থাৎ বছরের প্রথম দিনটিতে প্রতি গৃহে ধ্বজা বা পতাকা তুলতে হবে। বহু দেশে এ প্রথা সেভাবে পালিত না হলেও পশ্চিম এবং মধ্যভারতে আজও নববর্ষে পতাকা তোলা হয়। এর থেকে বোঝা যায়, এই পতাকা তোলার রীতিটি ভারতের অনেকটা অঞ্চল জুড়েই প্রচলিত।

পশ্চিমবঙ্গে পয়লা বৈশাখে ব্যবসায়ীকুল বিশেষভাবে সিদ্ধিদাতা গণেশ এবং লক্ষ্মীদেবীর অর্চনা করেন। ওইদিন বহু হিন্দু বাঙালি গৃহস্থ বিশেষভাবে লক্ষ্মীপূজা করে থাকেন। পূর্ব এবং দক্ষিণবঙ্গে এই দিনটিতে ভগবতী অর্চনা করা হয়। এক্ষেত্রে ভগবতী হলেন দেবী দুর্গা। সৌভাগ্য ও সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী। তাই বছরের শুরুতে তাঁর বিশেষ পূজা অর্চনা করে নতুন বছরের যাত্রার সূচনা করা হয়। বহু জায়গায় এই পয়লা বৈশাখের দিনে কুমারীপূজাও করা হয়।

যেসব গৃহস্থের বাড়িতে গোরু আছে ভগবতীর প্রতীক হিসেবে

মঞ্জুভাষ প্রকাশিত

প্রশান্ত প্রামাণিক-এর

কপিল থেকে চন্দ্রশেখর

মূল্য : ৬০০ টাকা

পুরাণ কাহিনীর বিজ্ঞানভাষ্য

মূল্য : ১৬০ টাকা

চিত্র মিত্র -র

বেদান্তের আলোয় গীতাঞ্জলি

মূল্য : ৩০০ টাকা

জাতীয়তাবাদী সাহিত্যিক

গুরু বিশ্বাস-এর

স্বপ্নলোকের চাবি

মূল্য : ২৫০ টাকা

পোকা

মূল্য : ২৫০ টাকা

বীজ

মূল্য : ১৭০ টাকা

পণ্যা

মূল্য : ১৫০ টাকা

পরীতলা

মূল্য : ২০০ টাকা

ঝোপড় পট্টি

মূল্য : ২৫০ টাকা

যুথিকা রায়-এর

আজও মনে পড়ে

মূল্য : ১৫০ টাকা

পরিবেশক

প্রিটোনিয়া

১৪ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ ফোন : ২২৪১ ২১০৯, ৬৪৫৪-২১০৯

email : publishers.pritonia2015@gmail.com

স্বস্তিকার সকল পাঠক-পাঠিকা,
বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে
আন্তরিক অভিনন্দন—

A Well Wisher

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ

সুপার

যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন

ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন

9830950831

ALWAYS EXCLUSIVE

Vandana (NR) ®

SAREES • SUITS

Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees

Contact No. : 033-22188744 / 1386

সেখানে বিশেষভাবে গোরুর পূজো করা হয়। ওইদিন গোয়ালঘর পরিষ্কার করে সেখানে দেবী দুর্গার পূজার ব্যবস্থা করা হয়। আর এই দিন থেকেই পালন করা হয় একমাস ব্যাপী কেশব ব্রত।

এইসব ব্রত, পূজার বৈশিষ্ট্য প্রতিক্ষেত্রেই সিঁদুর দিয়ে স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকা হয়। ঘটে তো বটেই এই দিন ব্যবসায়ীর নতুন হিসাব খাতার প্রথম পাতাতেও আঁকেন ওই স্বস্তিক চিহ্ন। সব মিলিয়ে বাঙালির ধর্ম জীবনের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হল এই স্বস্তিকা চিহ্ন। তবে স্বস্তিকা আঁকা হয় যজমান যে বেদভুক্ত সেই অনুযায়ী। যজু বা সামবেদে স্বস্তিকার হাত ও পা দুটি সোজা ও সমান্তরাল ভাবে আঁকা হয়। কিন্তু ঋগ্বেদ অনুযায়ী ওই হাত ও পা অনেকটা অর্ধবৃত্তাকার।

সব মিলিয়ে এসব কারণেই বাঙালির নববর্ষ উৎসবের সঙ্গে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কোনও যোগ নেই এমন কথা বলা যায় না।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক সলিল ত্রিপাঠির মতে বাংলা সন বা বঙ্গাব্দের পঞ্জিকার বিভিন্ন গণনা ও দিনক্ষণ গণনা করা হয় 'সূর্যসিদ্ধান্ত' অনুযায়ী। সূর্য সিদ্ধান্ত মতে 'ব্রাহ্মং দিব্যাং তথা পিত্র্যং প্রজাপত্যাং গুরোস্তমা। সৌরঞ্চ সাবনং চান্দ্রমার্ক্ষৎ মাজনি বৈ নব'—অর্থাৎ এদেশে প্রচলিত পঞ্জিকা ন-রকম মাসের পক্ষে সৌ, চান্দ্র, নক্ষত্র, সাবণ ও বার্হস্পত্য মাসের ভিত্তিতে গণিত হয়। এর মধ্যে সৌরমাসে বছর ও মাস প্রধানত গৃহীত হয়।

হালখাতা ঃ বাঙালির নববর্ষর অন্যতম অঙ্গ হালখাতা। হালখাতা চলতি বছরের হিসাবের খাতা। একবারে বড়ো শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ছাড়া আজ গড় বাঙালি ব্যবসায়ী-বণিককুলের আর্থিক বছরের শুরু পয়লা বৈশাখ থেকে। অনেকে অক্ষয় তৃতীয়ায় এই অনুষ্ঠান করা ও নতুন খাতা চালু করেন বৈশাখ থেকে চৈত্রের হিসেবে। হালখাতার প্রধানত দুটি পর্ব। একটি পর্বে পূজা অনুষ্ঠান ও দ্বিতীয় পর্বে খরিদ্দারদের আদর আপ্যায়ন ও নতুন ব্যবসা শুরু।

হালখাতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে গণেশ ও লক্ষ্মী পুজো। অনেকে অবশ্য নতুন খাতা স্থানীয় মন্দিরে নিয়ে গিয়ে পুজো করেন। তবে সেইসঙ্গে নিজেদের বাড়ি বা ব্যবসা স্থলেও পুজো হয়। মূলত খেরোবাঁধানো নতুন খাতার প্রথম পাতায় সিন্দুর দিয়ে স্বস্তিকা চিহ্ন ও দুপাশে টাকার ছাপ দেওয়া হয়। খাতার মাথায় লেখা থাকে সিদ্ধিদাতা গণেশ এবং নিজেদের ইষ্ট ও প্রিয় দেবতাদের নাম। তলায় নতুন বছর ও পয়লা বৈশাখ শুভ মহরত লিখে শেষ করা হয় খাতা।

হালখাতার প্রথম পর্বটি সকাল বেলায়। গণেশ- লক্ষ্মী ও খাতা পুজোর শেষে অনেকে দুপুরে কর্মস্থলে বা বাড়িতে কর্মী ও কিছু বন্ধুবান্ধব নিয়ে ভোজের আয়োজন করেন। কিন্তু বেশিরভাগরই দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় বিকেল থেকে। এই পর্বে ক্রেতাদের সরবত, মিষ্টি, নতুন ক্যালেন্ডার ইত্যাদি দিয়ে আপ্যায়িত করা হয়। ক্রেতারাও এই সময় সারা বছরের বকেয়া সম্পূর্ণ বা আংশিক মিটিয়ে দেন। যাঁদের কোনও বাকি নেই তাঁরাও আগাম কিছু অর্থ জমা দেন। সবমিলিয়ে দেওয়া-নেওয়া আদর-আপ্যায়ন ও আন্তরিকতায় হালখাতার এই দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানটি শেষ পর্যন্ত যেন একটি পারিবারিক উৎসবের রূপ নেয়।

বঙ্গাব্দের সূচনা ঃ এই বাংলা নববর্ষ এবং বঙ্গাব্দের সূচনা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা মত রয়েছে। একদল বলেন বঙ্গাব্দের সূচনা সপ্তম শতকে। রাজা শশাঙ্ক এই বঙ্গাব্দের প্রবর্তক। ঐতিহ্যগত দিক থেকেই এই বাংলা বছরটি বঙ্গাব্দ নামে পরিচিত।

আবার অনেকে মনে করেন, বৈশাখী ভারতের হিন্দুদের এক প্রাচীন কৃষি উৎসব। সেই উৎসবই পয়লা বৈশাখে নববর্ষের সূচনা করেছে। উত্তরপূর্ব ভারতে নববর্ষ বিক্রমাব্দ বা বিক্রমসম্বতের সঙ্গে যুক্ত। রাজা বিক্রমাদিত্য এর প্রবর্তক। খ্রিস্টপূর্ব ৫৭ অব্দে বিক্রম সম্বতের শুরু। তবে বাংলা বঙ্গাব্দ শুরু হয় তার সাড়ে ছশো বছর পরে ৫৯৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে।

বেশ কিছু ঐতিহাসিক আবার বঙ্গাব্দের প্রবর্তক হিসেবে দু'জন মুসলমান শাসকের নাম করেন। ওই দুই শাসকের একজন হলেন মুঘল সম্রাট আকবর (১৫৪২–১৬০৫ খ্রিঃ) এবং অন্যজন বাংলার সুলতান হুসেন শাহ (রাজত্বকাল ১৪৯৩–১৫১৪ খ্রিঃ)। এঁদের মধ্যে ঠিক কোনজন বঙ্গাব্দের প্রবর্তক তা নিয়ে ওইসব ঐতিহাসিক একমত নন। তবে ঐতিহাসিকদের একটি গরিষ্ঠ অংশ আকবরকেই এই কৃতিত্ব দিতে চান।

সম্রাট আকবরকে বঙ্গাব্দের প্রবর্তক বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁদের বক্তব্য, আকবরের আগে বঙ্গদেশে কর আদায় করা হতো হিজরি সনে। ইসলামি হিজরি সন গণনা করা হয় চন্দ্রমাস অনুযায়ী। ফলে সৌর-কৃষিচক্র অনুযায়ী ফসল ওঠার সময়ের সঙ্গে হিজরি সনের হিসেবের বিপাকে করদাতারা অসুবিধেয় পড়তেন। এই সমস্যা সমাধানের জন্যই আকবর দরবারের জ্যোতির্বিদ ফতেউল্লা সিরাজিকে ইসলামি চান্দ্র এবং হিন্দুদের সৌর পঞ্জিকার সমন্বয় ঘটিয়ে একটি নতুন পঞ্জিকা তৈরির নির্দেশ দেন। সেই অনুযায়ী তৈরি হয় নতুন পঞ্জিকা ও বছর। সেই বছরের নাম হয় ফসলি সন। এটিই বঙ্গাব্দ বলে ওই ঐতিহাসিকরা মনে করেন। তাঁদেরই কেউ কেউ মনে করেন বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ প্রথম বঙ্গদেশে কর আদায়ের জন্য 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠান ও আকবরের করনীতির প্রবর্তন করেন।

যাঁরা সুলতান হুসেন শাহকে বঙ্গাব্দের প্রবর্তক মনে করেন তাঁদের দাবি মানলে আকবরের অন্তত বছর পঞ্চাশ আগে বঙ্গাব্দের প্রবর্তন হয়।

অন্যদিকে, এই তত্ত্বের বিরোধীরা প্রমাণ হিসেবে আকবরি বছরের বহু শতাব্দী আগে তৈরি দুটি শিবমন্দিরের শিলালিপির উল্লেখ করেন। ওই শিলালিপিতে বঙ্গাব্দের উল্লেখ থাকায় স্পষ্ট বোঝা যায়, আকবরের সময় নয়, তার বহু আগে থেকেই বঙ্গাব্দ তথা পয়লা বৈশাখের উৎসবের প্রচলন ছিল।

বাংলা পয়লা বৈশাখ ত্রিপুরা, অসম-সহ বহু বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলেই পালিত হয়। পাঞ্জাব-সহ উত্তর ভারতের বহু অংশে দিনটি পালিত হয় 'বৈশাখী' নামে। অসমে দিনটির নাম 'রঙ্গলি বিহু' বা 'বহাগ বিহু', মণিপুরে 'শিলহেনবা', ওড়িশায় 'বিষুব সংক্রান্তি', কেরলে 'বিষু', তামিলনাড়ুতে 'পুথানডু', মিথিলায় 'জুইর শীতাল'। একইভাবে শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, লাওস, মায়ানমার ইত্যাদি দেশেও এই নববর্ষ হিসেবে এই দিনটি পালিত হয়।

সবশেষে বলতে হয়, ইংরেজির দাপটে অনেককিছু হারিয়েও পয়লা বৈশাখ এবং হালখাতা এখনও স্বমহিমায় বঙ্গ সংস্কৃতির এক হীরকসম জ্যোতির্ময় অনুষ্ঠান। ■

With Best Compliments from :

M. L. Pareek, FCA

Kotilya Consultants Limited

16-B, Shakespeare Sarani

B. K. Market, 1st Floor, Kolkata - 700 071

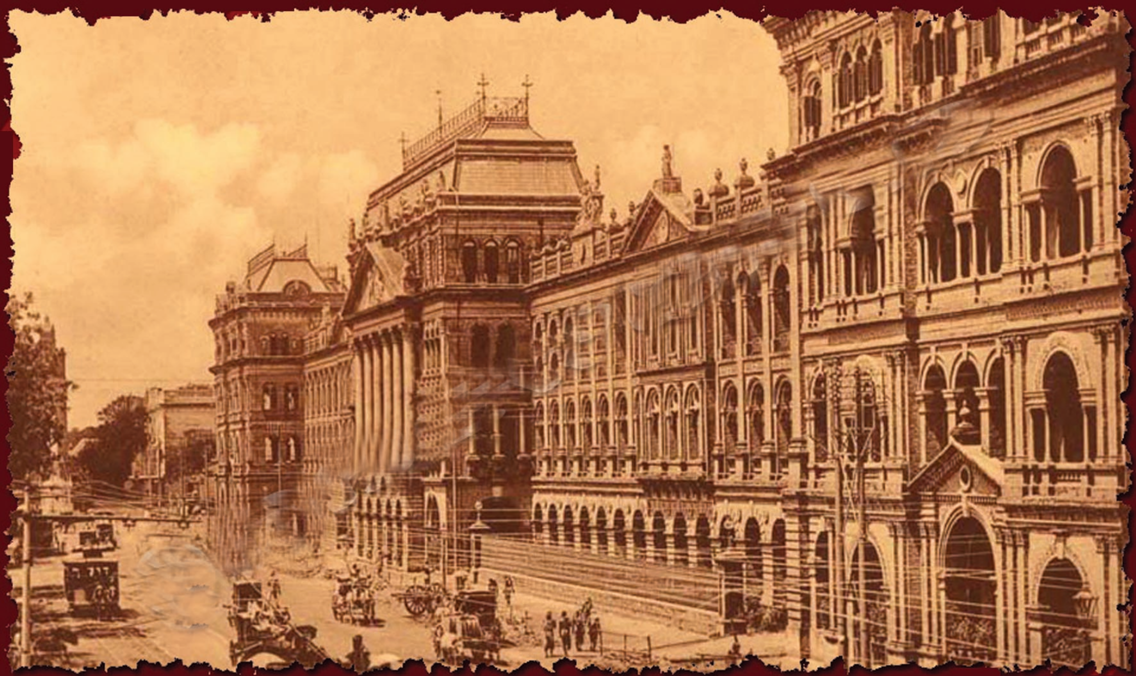

পুরোনো কলকাতার বাঙালি কারিগর

রাজা দাশগুপ্ত

শহর কলকাতা। একই সঙ্গে যেমন ইতিহাসের নানান গল্প-কাহিনির রঙে এ শহর রঙিন, তেমনি ইট-কাঠ- পাথরের বুকে নিহিত অন্য এক আলোয় ঝলমলে এ শহরকে কলের শহর বললেও কিন্তু ভুল হয় না মোটেই। পাতাল রেল, আলো ঝলমলে মল-সহ হাজার কিছুর উজ্জ্বলতায় চোখ ধাঁধানো একুশ শতকী এ শহরের সিটিস্কেপের দিকে তাকান, মনে পড়ে যেতে বাধ্য কবির আখর ঃ এ কলকাতার মধ্যে আছে আরেকটা কলকাতা। সেই আরেকটা কলকাতাকে হেঁটে দেখতে আর হয়তো পারব না আমরা, কিন্তু যদি ইতিহাসের পাতা ওল্টাই? পিছিয়ে যাই যদি গ্যাসের আলো, ঢালাই লোহার কারুকার্য, লাল ইটের চৌকো বা ছ'কোনা বাহারি চিমনি, গাড়ি টানার ছ্যাকরা ঘোড়াদের জল খাওয়ার জন্যে রাস্তার এখানে-ওখানে বসিয়ে রাখা কারুকার্যমণ্ডিত ঢালাই লোহার বিশাল মাপের জলপাত্র, দমকল ডাকার বাক্স ইত্যাদিতে শোভিত কোম্পানির আমলের সেইসব ধুলোটে গন্ধমাখা দিনগুলোয়, যখন এই কলকাতা শহরটা সবে গড়ে উঠছে? ইতিহাস বলে, হাওয়া কলই বলুন বা বাষ্পের যন্ত্র, টরেটক্কা বা কলের নৌকো—আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার বহু ফসলকেই সেদিন সবার আগে দুহাত তুলে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল ভারতের এই একটাই শহর। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা তো ছিলেনই, কিন্তু বাঙালি কারিগরদের প্রভূত উৎসাহ সেদিন যদি সত্যিই না থাকত তাহলে কি এত সহজে আধুনিক ভাবনার অভিষেক ঘটতে পারত এখানে? প্রশ্ন বটে। এবং সে প্রশ্নের ধরাবাঁধা জবাব হয়তো হাতে গরম মিলবে না, কিন্তু যদি একটু খুঁজি? শতাব্দী প্রাচীন ইতিহাসের ধুলো ঘেঁটে, আসুন না, চেষ্টা করা যাক একটু।

বিশ্বায়নের পাকে পড়ে এখানে-ওখানে হাই রাইজার আর নগরায়ণের নিত্যি নতুন কেতার চাপে আজ হয়তো হারিয়ে যেতে বসেছে, কিন্তু এই সেদিনও কলকাতার রাস্তায় পা রাখলেই দেখা মিলত সেই প্রথম আমলের কলের শহরের হরেক নিদর্শনের। বেশ মনে আছে সাতের দশকের গোড়ায় কলকাতায় পাকাপাকি ডেরা বাঁধার পর অভিভাবকদের কারো সঙ্গে শহর চিনতে

বেরিয়ে বৌবাজার স্ট্রিট-বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের মোড়ে, পুরোনো একটি বাড়ির গায়ে লাগানো বিকল গ্যাসের বাতিস্তম্ভের লোহার ব্র্যাকেটের গায়ে ঢালাই হরফে লেখা থাকতে দেখেছিলাম যে সালটি, পরে জেনেছি সেই বছরেই এ শহরের পথে প্রথম গ্যাসের বাতি জ্বলেছিল। আর জলের কল? ১৮৩৩-এ ডয়েলির আঁকা চাঁদপাল ঘাটের একটি ছবিতে চিত্রিত চিমনি থেকেই মেলে শহরে প্রথম জলের কলের হদিশ। কয়লা পুড়িয়ে জল থেকে বাষ্প বানানোর কলে অমনই চিমনি লাগে। জলতোলার জন্যে ওই বাষ্পীয় কলটি নাকি বানানো হয়েছিল শোনা যায় আরো আগে, ১৮২২-এ। তবে কলকাতার আকাশে গলগল করে ধোঁয়া ওগরানো শুরু হয় আরও কদিন বাদে, ১৮৩০ নাগাদ। আজকের হাওড়া ব্রিজ থেকে একটু উত্তরে, স্ট্রান্ড রোডে তখনকার টাঁকশাল বা মিন্ট হবার পর। পেল্লায় প্রাসাদোপম বাড়িটি এই সেদিনও দেখা যেত, তবে তার একাংশের দখল নিয়েছিল সি আর পি বা সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ। টাঁকশাল কর্তৃপক্ষের সিলভার রিফাইনারিটিও বহুদিন যাবৎ পরিত্যক্তই ছিল। ১৮৩৪-এর ২৬ ফেব্রুয়ারির 'সমাচার দর্পণ'-এর দেওয়া খবর অনুযায়ী ১৮২৪-এ ওই বাড়ির ভিত তৈরি হয়। বানিয়েছিলেন, 'বঙ্গদেশস্থ গৃহাদি নির্ম্মাণের অধ্যক্ষ অথচ তদ্বিষয়জ্ঞ শ্রীযুক্ত কাপ্তান ফর্বস সাহেব'। তৈরি করতে লেগেছিল ৬ বছর। ওই 'সমাচার দর্পণ'-এর হিসেব অনুযায়ীই এখানে, 'উপরিলিখিত ইমারত অপেক্ষা মৃত্তিকার নিচে অধিক ইমারত আছে.....তাহার মধ্যে বাষ্পীয় পাঁচ কল আছে, বিশেষত দুই কল ৪০ অশ্ব ও এক কল ২৪ অশ্ব ও এক কল ২০ অশ্ব এবং এক কল ১৪ অশ্বতুল্য বল। এই যন্ত্রের দ্বারা দিবসে সাত ঘণ্টার মধ্যে ৩,০০,০০০ খানি রুপা মুদ্রিত হইতে পারে'। 'শ্রীযুক্ত কাপ্তান ফর্বস' বলতে এখানে যাঁর কথা এল তিনি উনিশ শতকের কলকাতায় বিদেশি ইঞ্জিনিয়ারদের অন্যতম ক্যাপ্টেন নেয়ার্ন ফর্বস। কলকাতার সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল তাঁরই তৈরি। কলকাতাকে কেন্দ্র করে অভ্যন্তরীণ জলপথে সরকারি স্টিমার যাতায়াতের বন্দোবস্তের তত্ত্বাবধানেও তিনিই ছিলেন অন্যতম সর্বেসর্বা। আর টাঁকশালে যেসব বাষ্পীয় কল আমদানি হয় সেসব সরবরাহ করেছিল বোল্টন অ্যান্ড ওয়াট কো.। এই ওয়াট আবার আর কেউ নন, স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কর্তা স্বয়ং জেমস ওয়াট।

যাই হোক, প্রথম আমলে সায়েবসুবোদের তত্ত্বাবধানে এই যে উদ্যোগপর্বের শুরু, খুব শিগগিরই তার রাশ ধরতে এগিয়ে এলেন ভারতীয় তথা বাঙালি কারিগররা। আধুনিক বাঙালির কারিগরি কল্পনা ও দিশি উদ্যোগের সেই আদ্যিকালের ইতিহাস ঘাঁটতে বসলে প্রথম যে নামটি উঠে আসে, সে নাম কলকাতার উপকণ্ঠে টিটাগড় নিবাসী গোলকচন্দ্রের। কিন্তু কেন? কী করেছেন এই গোলকচন্দ্র? কী জন্যে আধুনিক বাঙালির যন্ত্রবিদ্যাচর্চার ইতিহাসে আজও তাঁর নাম অগ্রগণ্য? সাময়িকভাবে শ্রীরামপুরের কাগজকলে বিলেতের ল্যাংকাশায়ার থেকে আনানো প্রথম বাষ্পীয় ইঞ্জিনটি কেবলমাত্র সযত্নে পর্যবেক্ষণ করতে করতে তিনি নাকি কোনোরকম বিদেশি সাহায্য বা বিদেশি উপকরণ ছাড়াই বানিয়ে ফেলেছিলেন ছোট আকারের একটি বাষ্পীয় ইঞ্জিন। ১৮২৮ সালের ১৬ জানুয়ারি কলকাতার টাউন হলে শুরু হওয়া এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক প্রদর্শনীতে গোলকচন্দ্রের মেশিনটি প্রদর্শিতও হয়। খ্যাতি মিলেছিল বটে গোলকচন্দ্রের। স্বীকৃতিও। তবে ১৮৫২-তে কোম্পানিবাহাদুর এদেশে প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন পাতার কাজকে সরকারি অনুমোদন দেবার পর এই বিভাগে প্রথম ভারতীয় 'ইনচার্জ' শিবচন্দ্র নন্দীই হিসেব মতন প্রথম ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার, যিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে দুর্বার গতি পদ্মার বুকে সাত মাইল ব্যাপী 'সাবমেরিন কেবল' পাতার কাজ নিতান্ত 'অল্প ব্যয়ে' সমাধা করেন। টেলিগ্রাফের তার বসাতে তালগাছের গুঁড়ি ব্যবহার করাও শিবচন্দ্রের অভাবনীয় উদ্ভাবনী শক্তির নিদর্শন। শিবচন্দ্র মারা যান ১৯০৩-এ। বিউবনিক প্লেগে। তাঁর পর দীর্ঘকাল আর কোনও ভারতীয় টেলিগ্রাফ বিভাগে কোনও উচ্চপদ পাননি। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, সিপাহি বিদ্রোহের আগেই ৪২৫০ মাইল ব্যাপী টেলিগ্রাফ লাইন এবং ৪৬টি সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়ে যাওয়ায় ৯২৮ মাইল টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা ধ্বংস করতে পারলেও বিদ্রোহীরা কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা পুরো বিকল করতে পারেননি। ১৮৫৭-র আগেই বিভাগীয় ওপরওয়ালা উইলিয়াম ও'শনেসি ব্রুক বিলেত চলে যাওয়ায় আর তাঁর জায়গায় আনা কর্নেল স্টুয়ার্টও সামরিক কারণে অনুপস্থিত থাকায় টেলিগ্রাফ বিভাগের প্রধান দায় কিন্তু সামলাতে হয়েছিল শিবচন্দ্রকেই। কোম্পানি অবশ্য পরে শিবচন্দ্রের এই অবদান স্মরণ করেই তাঁকে রায়বাহাদুর খেতাব দিয়েছিল। উত্তর কলকাতার বড়বাজার এলাকার 'শিবু নন্দী লেন'-ই রায়বাহাদুর খেতাবে সম্মানিত অসামান্য এই মানুষটির প্রতি কলকাতার সবেধন নীলমণি শ্রদ্ধার্ঘ্য।

তা, এ তো গেল সেই প্রথম আমলের দুই বাঙালি ইঞ্জিনিয়ারের কথা ও কাহিনি। এবার না হয় আসা যাক সেই আমলের বাঙালি কারিগরদের কথায়, যাঁদের নাম ইতিহাস মনে রাখেনি বটে কিন্তু কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে রয়ে গেছে তাঁদের কর্মকাণ্ড। হিসেব বলছে, ভারতে প্রথম কাগজের কল স্থাপিত হয়েছিল ১৭১৬-য়, সেদিনের

ট্রাংকোয়েবার বা আজকের তামিলনাড়ুর নাগাপাত্তিনাম জেলার থারাঙ্গামবাদির প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনের উদ্যোগে। তাঁরা সেখানে কেবল কাগজকলই বসাননি, ছাপাখানা ও হরফ নির্মাণের বন্দোবস্তও করেছিলেন। এসব কল সম্পর্কে কিছুই জানা না গেলেও কোনও সন্দেহ নেই যে, সেসব কলে কাজ করতেন ভারতীয়রাই। শ্রীরামপুরের মিশনারিরা প্রথম প্রথম তাঁদের ছাপাছাপির কাজের জন্যে পাটনা কাগজের ওপর নির্ভর করলেও পরে যে কাগজে বইপত্র ছাপতে থাকেন তা আমদানি করা হত বিদেশ থেকে। এই সমস্যা দূর করার জন্যেই ১৮০৯-এ বসানো হল প্রথম কাগজকল। উইলিয়াম ওয়ার্ড আর রেভারেন্ড জোসুয়া রো সে কলের দায়িত্বে থাকলেও কাজটা কিন্তু করতেন বাঙালি কারিগররাই, যাঁদের নাম আজ আর জানার কোনও উপায় নেই। এবং হিসেব বলছে ১৮১১-তেই এখানে আধুনিক উপায়ে কাগজ তৈরির কাজও শুরু হয়ে যায়, যে কাজও চালাতেন কিন্তু দেশি কর্মীরাই। গবেষকদের মতে, ট্রেড মিল নামে প্যাডল চালিত এই কলের নির্মাতাও ছিলেন এইসব কর্মীরাই। শ্রীরামপুরের কেরি গ্রন্থাগারে রাখা একটি পুরনো মানচিত্র অনুযায়ী এইসব কারিগরদের থাকার জন্যেই ওই কল সংলগ্ন একটি এলাকার নামই হয়ে যায় 'কামারপাড়া'। হিসেব মতন প্রথমেরও প্রথম ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার গোলকচন্দ্র টিটাগড়ের লোক হলেও পরে কিন্তু এই কামারপাড়াতেই বাসা নিয়েছিলেন।

বাঙালি কারিগরদের চাহিদা তখন বাড়ছে। অন্য সব ক্ষেত্রেও তখন তাঁদের বেজায় চাহিদা। যেমন ধরা যাক, ভারতের নদীতে প্রথম স্টিমারের আবির্ভাব ১৮১৯-এ; তবে কিনা সেটা মোটেই কলকাতায় নয়, অযোধ্যায়। নবাবসাহেব গাজিউদ্দিন হায়দারের সেই স্টিমারটি বানিয়ে দেন জেসপ কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা হেনরি জেসপ স্বয়ং। কিন্তু ঘণ্টায় ৭/৮ মাইল গতির সেই বাষ্পীয় জলযান তো নবাবসাহেবের শখের খেলনা ছাড়া কিছুই ছিল না। তাহলে যাত্রী পরিবহণ? ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকা কলকাতা শহর তখন সাহেবসুবোদের চোখের মণি। তবু কিন্তু কলকাতার জলপথে প্রথম যে বাষ্পীয় জলযানের দেখা আমরা পাচ্ছি সেটি মোটেই যাত্রী পরিবহণের জন্যে আসেনি। সে যেটা প্রধানত করত তা হল গঙ্গার বুক থেকে পলিমাটি তোলা, মানে সোজা কথায় ড্রেজিংয়ের কাজ। নইলে সাহেব কোম্পানির যেটা আসল উদ্দেশ্য সেই কেনাবেচার মাল তোলা-নামানোর কাজই ডকে উঠবে যে। সে যাই হোক, যাত্রী বহনের জন্যে প্রথম যে বাষ্পীয় জলযানকে গঙ্গার বুকে আমরা পাচ্ছি তার নাম 'ডায়না'। ১৮২৩-এর ১২

জুলাই খিদিরপুরে কিড অ্যান্ড কো.-র জাহাজঘাটা থেকে সেটি যাত্রা শুরু করে। খেজুরি, সাগর রোড থেকে কলকাতা অব্দি যাত্রী পরিবহণে ব্যবহৃত হলেও ডায়নার খরচাপাতি কিন্তু কেবলমাত্র যাত্রীভাড়া থেকে উঠত না। শেষে ১৮২৫-তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিই সেটি কিনে নেয়। কলকাতার প্রথম সেই কলের নৌকোটিই ব্রিটিশবাহিনীর প্রথম বাষ্পীয় রণতরীও বটে। প্রথম ইঙ্গ-বার্মিজ যুদ্ধে (১৮২৪-১৮২৬) ডায়নার বিক্রম ইতিহাস প্রসিদ্ধ। যাই হোক, ১৮৩০ পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতের যাবতীয় স্টিমার কলকাতার জাহাজঘাটাতেই তৈরি হতো, কেবলমাত্র ইঞ্জিনটিই আমদানি হতো বিলেত থেকে। ইতিহাস বলে, এই জাহাজ শিল্পই হলো গিয়ে কলকাতা তথা ব্রিটিশ ভারতের প্রথম ভারী শিল্প। সেই ১৭৬৯-এ প্রথম জাহাজ তৈরির পর মোটামুটি ১৮২১ অব্দি হিসেব ধরলে এই সময়কালের মধ্যে মোট ২৭২টি জাহাজ কলকাতার জাহাজঘাটায় নির্মিত হয়েছে। কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিতে লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন যেহেতু এদেশে হত না, বিশ শতক অব্দি তা রীতিমতন ঠেকিয়ে রাখা হয়েছিল ফলে বিলিতি জাহাজের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় প্রথমত উৎপাদন ব্যাহত হতে থাকল, এবং শেষমেশ জাহাজঘাঁটিগুলো হয়ে দাঁড়ায় স্রেফ মেরামতির কারখানা। অথচ দেশি কারিগরদের কুশলতা নিয়ে কি কোনও প্রশ্ন ছিল সত্যিই? না। কারণ, তা-ই যদি হতো তাহলে কলকাতার এইসব দেশি কারিগররাই ১৮২৬-এ খিদিরপুরে জে. অ্যান্ডারসন কো.-র তরফে কীভাবে নির্মাণ করলেন কমেট ও বাটারফ্লাই নামে ২০ অশ্বশক্তির দু-দুটি বাষ্পীয় জলযান? আর যদি কেবল মেরামতির প্রশ্নও ওঠে তাহলেও কলকাতা যে সেদিন মোটেই পিছিয়ে ছিল না তার সাক্ষ্য দেয় ইতিহাসই।

অর্থাৎ? অর্থাৎ আর কিছুই নয়, আধুনিকতার সেই আদ্যিকালেও কিন্তু বাঙালি তথা কলকাতা কারিগরি কুশলতায় মোটেই পিছিয়ে ছিল না। ঔপনিবেশিকতার নিজস্ব অর্থনৈতিক চাপ, যাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ১৯০৫-এ স্বয়ং কার্জনকে বাধ্যতামূলকভাবে মানতে হয়েছিল যে, 'অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এক্সপ্লয়টেশন গো হ্যান্ড ইন হ্যান্ড', এই শহরের মেরুদণ্ডকে বাঁকিয়ে মাপমতন করে নিতে কীভাবে সচেষ্ট হয়েছিল তার প্রমাণ মিলবে একটাই হিসেব পেশ করলে যে, ১৮৩৮ পর্যন্ত সরকারি এইসব উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, ইঞ্জিন ড্রাইভার, বয়লার নির্মাতা বা বয়লার মেকানিক ইত্যাদি পদে যে ৭৭ জন সাহেব বহাল হন, কর্তৃপক্ষ কিন্তু তাঁদের অর্ধেককেই ছাঁটাই করতে বাধ্য হন আলস্য, অকর্মণ্যতা আর সর্বোপরি স্রেফ অযোগ্যতার জন্যেই। এবং তারপর কিন্তু বাধ্যতামূলক শরণ নিতে হয় সেই ভারতীয় কারিগরদের নিতান্তই দেশি কর্মকুশলতারই। অথচ তাঁরা না পেয়েছেন বাড়তি কোনো তালিম, না পেয়েছেন বাড়তি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য। বরং ইতিহাস বলে, ১৮৪০-এর মে মাসে কলকাতা থেকে বিদেশগামী একটি জাহাজ সিঙ্গাপুরে পৌঁছবার পর কোনও ব্যক্তিগত কারণে তার সাহেব চালক দায়ভার ছাড়তে বাধ্য হলে তাঁর জায়গা নিতে হয় ওই জলযানের ইঞ্জিনরুমের কয়লা জোগানদার, সোজা কথায় কোলবয়দের মাথা জনৈক সামসেরকে। কিন্তু সাহেব চালকের মাইনে মাসে ১২৫ টাকা হলেও সামসেরের ভাগ্যে কিন্তু জুটেছিল বরাদ্দ ১৭ টাকার ওপরে আর মাত্র ১৩ টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ৩০ টাকা। কেবল কি তা-ই? হিসেবই বলছে, ১৮৩৩-এ বিলেত থেকে যে সব ইঞ্জিন ড্রাইভার, বয়লার নির্মাতাদের আনানো হয়েছিল তাঁরা যেখানে মাইনে পেতেন যথাক্রমে ২০০ এবং ১৫০ টাকা করে, সেখানে দেশি জয়নার মিস্ত্রিদের মাইনে কিন্তু ছিল ১২ টাকা, তাঁদের সহকারীদের ৮ টাকা, কার্পেন্টারদের ১০ টাকা, তাঁদের সহকারীদের ৬ টাকা ৮ আনা, ভাইসম্যানদের ১২ টাকা, ব্রেজিয়ারদের ১৬ টাকা এবং তাঁদের সহকারীদের ১২ টাকা করে।

তবু হ্যাঁ, ইতিহাস এগিয়েছে। সময়ের মানচিত্রের সঙ্গে বদলেছে শহরের চেহারাও। ১৭৬৫-তে ইংলন্ড ও স্কটল্যান্ড সফরকালে দেখা পানিচাক্কি বা হাওয়াকল-সহ যেসব চমকে দেওয়া কলের কথা মির্জা শেখ ইতিসামুদ্দিন পরে তাঁর 'শিফার্গ-নামা এ বিলায়েত'-এর পাতায় তুলে দিয়েছিলেন, এক সময় সেসব ভারতে এসে পৌঁছেছে। পৌঁছেছে ইতিসামুদ্দিনেরও ৩৪ বছর বাদে বিলেত গিয়ে মির্জা আবু তালেব খান সায়েব স্টিম ইঞ্জিন, জল তোলার কল, এনগ্রেভিং, বাষ্প চালিত জল সরবরাহ ব্যবস্থা–সহ যা দেখে সচকিত হয়েছিলেন, সেসবও। কিন্তু যেটা মোটে বদলায়নি তা হল উপনিবেশ তথা ঔপনিবেশিক মানসিকতা। যত সময় গেছে নানান বিচিত্র কায়দায় সে কায়েম করেছে নিজের শাসনের রাশটাকে। বদলে যাওয়া সময়ের সঙ্গে তাল রেখে ঔপনিবেশিক আর উপনিবেশিতের মন/মানসিকতার এই যে বদলের রূপরেখা, এর রঙিন ইতিহাস এখনো সার্বিকভাবে লেখা হয়নি। হয়তো কখনো হবে। কখনো।

তথ্যসূত্র ঃ

The life of William Currey shoemaker and Missionary : George Smith, London

Steamboats on the Ganges : H. T. Bernstein, Calcutta

India To-day : R. Pulme Dutt

কারিগরি কল্পনা ও বাঙালি উদ্যোগ ঃ সিদ্ধার্থ ঘোষ, দে'জ

পয়লা বৈশাখের বর্ষবরণ

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথ 'শেষ মধু' কবিতায় লিখছেন,

"কাল যে কুসুম পড়বে ঝরে
তাদের কাছে নিস গো ভরে
ওই বছরের শেষের মধু
এই বছরের মৌচাকেতে।"

নববর্ষ তো পুরনো বছরকে বাদ দিয়ে নয়; বরং বলা যায়, পুরনো দুঃখ-সুখ, আনন্দ-বেদনার ধারাবাহিকতা নিয়েই বর্ষবরণ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাই লিখেছিলেন, "ভূত-রূপ সিন্ধু জলে গড়ায়ে পড়িল বৎসর"। যে বছর চলে যায়, তা অতীত ইতিহাস; তাতে কত শত আশা-লতা শুকিয়ে মরে, তাতে জীবনের অসংখ্য বীজ ভূতে বিফল হয়; তার তিমিরে ডুবে যায় জীবনের রবি। স্প্যানিশ কবি, ঔপন্যাসিক ও দার্শনিক জর্জ সান্টায়ানা-র কথায়, "Those who cannot remember their past are condemned to repeat its errors." নববর্ষের আনন্দবার্তার মাঝে তাই ফেলে আসা দিনগুলি থেকে ভুলের ফর্দ বানিয়ে সেই ভুল করা থেকে আমাদের বিরত হতে হবে। তবে ইতিহাস যেন দেশের সত্যিকারের ইতিহাস হয়। 'আত্মজাতিগৌরবান্ধ, মিথ্যাবাদী, হিন্দুদ্বেষী মুসলমানের কথা' (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) না হয়। আত্ম-জাগরণ যেন মহাকালের রথে চাপা পড়ে না যায়। বরং আত্মবিস্মৃতির মহা-মৃত্যু (স্বামী প্রণবানন্দ) থেকে জেগে নতুন সংকল্প বাঁধাই হবে বর্ষবরণ। বাংলায় যতটুকু আলো এখনো আছে তা নিবে গিয়ে অন্ধকারে বাঙালির গৃহ আবৃত হবার আগেই তাকে জীবনের পরতে পরতে মাখার উদ্‌যাপন হোক নববর্ষ। বাঙালির বর্ষপঞ্জিতে নববর্ষ হোক হিন্দুমিলনের দিন। "করো সুখী, থাকো সুখে/প্রীতিভরে হাসিমুখে/ পুষ্পগুচ্ছ যেন এক গাছে। / তা যদি না পার চিরদিন,/একদিন এসো তবু কাছে" (নববর্ষ, চিত্রা কাব্যগ্রন্থ, রবীন্দ্রনাথ)। কিংবা অক্ষয়কুমার বড়ালের মতো বলা যেতে পারে, "চারি-দিকে হাসি,/কাছে আসা-আসি/ ভালবাসা-বাসি সরম পাশে।/পরি তবে মালা,/হয় হোক্ জ্বালা,/গাই তবে—থামুক্ শ্বাসে" (নববর্ষে, কল্পনা)। যেন বলতে পারি, "বর্ষ ঘুরে গেল, /ধরা ঘুরে এল,/আমার হৃদয় ঘুরিবে না কি!"

কালচক্রের একটি বিশেষ সময়ের ফিরে আসাই হল নববর্ষ। প্রকৃতির নানান সংকেতে, নানান সাজে তা ফিরে ফিরে আসে। নববর্ষও আসে তার আপন রূপবৈচিত্র্য নিয়ে। বাংলা ক্যালেন্ডারে নববর্ষ হল পয়লা বৈশাখ। চৈত্রের চিতাভস্ম উড়িয়ে আসে বৈশাখ। ধরা পড়ে বিশ্বপ্রকৃতির পরিবর্তন, রূপবৈচিত্র্যের প্রভেদ। বসন্তের শেষে গ্রীষ্মের আগমনেই আসে পয়লা বৈশাখ।

একসময় ফাল্গুনী পূর্ণিমার তিথিতে নববর্ষ উদ্‌যাপিত হতো। দোলযাত্রা ছিল তার ধারক ও বাহক। ফাল্গুনী পূর্ণিমার পর চৈত্র মাসকে প্রথম মাস ধরে বারোমাসের হিসেব হতো। এজন্যই বুঝি একটি কৃষি ছড়া এভাবে শুরু হয়েছে—"চৈতে গিমা দিতা, /বৈশাখে নালিতা মিঠা,/জ্যৈষ্ঠে অমৃত ফল।" বছরের প্রথম মাসে ভেষজরূপ তিতো খাবার প্রচলন ছিল। পয়লা বৈশাখেও নিম-মুসুরির মণ্ড খাবার প্রচলন আছে। শরীরকে মজবুত রাখতেই এই তিতো ভক্ষণ।

আর ওই যে বনবাসীদের 'বাহা পরব', ওটাও তো নববর্ষ ধারণা, নব বসন্তের পুষ্প পরিণতি। এটা অনুষ্ঠিত হয় ফাল্গুনী পূর্ণিমার কাছাকাছি সময়ে। সরকারের অর্থ-বর্ষ শুরুটাও কিন্তু লক্ষ্য করার মত বিষয়। যেহেতু বাঙালির পয়লা বৈশাখে কোনোও শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান নেই, তেমন লৌকিক আচারও চোখে পড়ে না, তাই অনুমান করা যায়, বাংলার নববর্ষ আদিতে অন্য সময়ে পালিত হত। হয়তো মুসলমানি প্রভাবে বাধ্য হয়ে বাঙালি হিন্দু মতৈক্যে পৌঁছাতে নতুন দিন মেনে নিয়েছিল।

খনার বচনে দেখতে পাই, "ফাল্গুনে আগুন চৈতে মাটি/বাঁশ বলে শীঘ্র উঠি।" ঝরে পড়া, খসে পড়া পাতায় আগুন লাগিয়ে, তার ছাই মাটিতে মিশিয়ে পটাশ ও জৈব অঙ্গারের জোগান দেওয়া এক পুরাতন কৃত্য এবং বর্ষবরণের অঙ্গ। দোল ফাল্গুনের পূর্বরাত্রে হোলিকা রাক্ষসীকে পুড়িয়ে মারার উৎসব বা 'চাঁচড়' একরকম বনফায়ার। আদিম মানুষের যাযাবর জীবনে জঙ্গল পুড়িয়ে তার ছাইয়ে ফসলের দানা ফেলে কৃষিকাজ সম্ভবত সেই বনফায়ারের আদি কথা। এভাবেই শুরু হত চাষের নতুন মরশুম। যেহেতু কৃষ্টির সঙ্গে কৃষির যোগ থাকে, তাই এই স্প্রিং-ফেস্টিভ্যালকে নববর্ষের দ্যোতক হিসাবে ভাবা যায়। একদা উর্বরা বসুন্ধরা মায়ের কাছে আত্মনিবেদনের উৎসব ছিল নববর্ষ। নতুন বছরে নতুন করে কোমর বাঁধতে হবে, জমি তৈরি করতে

With Best Wishes :-

Radha Electricals Private Limited

Factory :

Jalan Industrial Complex

Gate No. 3, Mouza - Beniara, P.S.- Domjur

Dist. - Howrah - 711 411

With Best Compliments From :

ALLIANCE MILLS (LESSEES) LTD.

18, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

Phone : 2243-6401 / 02

Quality manufacturers and leading exporters of hessian cloth and bags, sacking cloth and bags and twine

E-mail : alliance@cal12.vsnl.net.in

Fax : 91-33-22202260

GRAM : ALJUTLES

MILLS

Alliance Jute Mills

Jagatdal 24 Paraganas

Phone : 2581-2745 / 2746 (Bhatpara)

হবে, বর্ষার জল ধরে রাখার জলাধার কাটতে হবে।

এককালে বসন্ত বন্দনার মধ্য দিয়ে নববর্ষের সূচনা ছিল। ফুলের পরবে পুষ্পোপাসনার মধ্যে আগামীদিনের খাদ্যের প্রতিশ্রুতি। কারণ ফুল থেকে আসবে ফল। ‘‘ফুল কহে ফুকারিয়া, ফল, ওরে ফল,/ কতদূরে রয়েছিস বল মোরে বল।/ফল কহে, মহাশয়, কেন হাঁকাহাঁকি,/তোমারি অন্তরে আমি নিরন্তর থাকি’’ (ফুল ও ফল, কণিকা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। এই যে রূপান্তরের নান্দনিকতা, এটাই খাদ্য-সংস্কৃতি। বাহা পরবে তাই শস্য পাবার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রাচীন নববর্ষের ধারণা।

অনেকের ধারণা, পয়লা বৈশাখের আগে অঘ্রাণ মাসে শুরু হত নববর্ষ। নবান্নের কথা স্মরণ রেখেই হয়তো মার্গশীর্ষ মাস ছিল অগ্রহায়ণ। কারণ ‘অগ্র’ শব্দের অর্থ সামনে; ‘হায়ণ’ মানে হল বৎসর; কাজেই বছরের গোড়ার মাস অঘ্রাণ। ফসলের ভরা মরাই নিয়ে চাষি নববর্ষের আনন্দে মাতবেন এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কার্তিকের অন্নাভাবের পর নবান্নের ফসলপ্রাপ্তি, আর তারই প্রেক্ষিতে নববর্ষের সূচনা। ‘নবান্নে-নববর্ষ’-এ রয়েছে নানান হিন্দু লৌকিক আচার-সংস্কার বিশ্বাসের নানা আঙ্গিক; বিশেষত ধান্যলক্ষ্মীর পূজা।

পয়লা বৈশাখে কি তেমন কোনও হিন্দু-আচারের যোগ আছে? কেউ বলবেন, হালখাতার গণেশ-লক্ষ্মী। এটা হয়তো পরবর্তীকালে চাপানো। ভারতীয় অব্দরীতি প্রসঙ্গে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের মতে, কার্তিক মাস থেকে বছরের সূচনা। অভিধানে সুবল মিত্র জানিয়েছেন, অঘ্রাণ থেকে বর্ষ শুরু হত। নৃতত্ত্ববিদ সুহৃৎ কুমার ভৌমিক বলেছেন, নবান্নই একসময় নববর্ষের উদ্বোধন করত।

তার মানে দেখা যাচ্ছে নববর্ষ উদ্‌যাপনের দুটি ঘরানা। প্রথম, শরত-অন্তিম নববর্ষ, যেখানে কার্তিক বা অগ্রহায়ণ বছরের শুরু এবং নবান্ন তার ভিত্তি। দ্বিতীয়, বসন্ত-ভিত্তিক নববর্ষ, যেখানে কৃষক নব আনন্দে জেগে কৃষিকাজের উদ্যোগী। তাই প্রথমটি ফসলোত্তর নববর্ষ আর দ্বিতীয়টি প্রাক-ফসলী নববর্ষ।

কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সময় থেকে বৈশাখকেন্দ্রিক বারোমাস্যা পাই। বাংলার বারোমাসি ছড়াতেও বৈশাখ মাসে বছর শুরু। ‘‘চৈত্র মাসে বাসন্তী পূজায় ধুমধাম বেশ,/বৈশাখ মাসে বছর আরম্ভ, চৈত্রেতে শেষ’’ (ভবতারণ দত্ত সম্পাদিত)।

আর্থিক বছরের ধারণা আর বর্তমান বাংলা নববর্ষ কোথাও যেন একসূত্রে মিলে যায়। ইওরোপের নানান দেশে কয়েক শতাব্দী আগে মার্চই ছিল প্রথম মাস। পরবর্তীকালে ইংরেজি মাসগুলি স্থান পরিবর্তিত হয়েছে ক্রিসমাসের দিকে নজর দিয়ে। খ্রিস্টীয় প্লাবনে জানুয়ারি হল প্রথম মাস, কিন্তু মার্চ তার গৌরব হারালো না। পৃথিবীর নানা দেশে মার্চ-এপ্রিল হল বর্ষ-সন্ধিক্ষণ; আর্থিক লেনদেন জমা করার পালা। ভারতে সেই ধারা চলছে, তা ইংরেজি ক্যালেন্ডার ভিত্তিক নয়।

জানা যায়, পোপ গ্রেগরি --১৩ জানুয়ারি মাসকে প্রথম মাস হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেন ১৫৮২ সালে। আবার বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্যে একসময় বুদ্ধ-পূর্ণিমা বা বৈশাখী পূর্ণিমার মাসে বৎসর গণনা শুরু করা হয়। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে, বাংলার হিন্দু রাজা শশাঙ্ক অসম বিজয়ের পর বাঙালির হৃদয়ে তা স্মরণীয় করে রাখতে বাংলা ক্যালেন্ডারের সূচনা করেছিলেন। আবার অন্যদের ধারণা বাঙালির নববর্ষ মোগলদের পত্তন।

জানা যায়, হিজরি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী চান্দ্র মাসের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া বছরে বাঙালিদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট দিনে রাজস্ব আদায় করা মোগলদের পক্ষে সমস্যা হচ্ছিল। কারণ অনেক সময় তা ফসল কাটার সঙ্গে সাযুজ্য থাকছিল না। ফসল যখন গোলায় নেই, তখন চাষি রাজস্ব দেবে কীভাবে? শোনা যায়, এর সমাধান করেছিলেন আকবর। তিনি নাকি মুসলিম জ্যোতিষী ফয়তুল্লা সিরাজকে হিন্দু সৌর বর্ষপঞ্জি অনুসরণে নতুন ক্যালেন্ডার তৈরি করতে বলেছিলেন। এর প্রথম মাসের দিনটি শুরু হয়েছিল ১৫ এপ্রিল। ক্যালেন্ডারের নাম ‘তারিখ-ই-ইলাহি’। ১৫৮৫ সালের ১০ মার্চ বাংলা ক্যালেন্ডারটি রচিত হলেও ১৫৮৬ সালের ১০ মার্চ তার সিংহাসন প্রাপ্তির দিনটি থেকে তা বলবৎ হয়। ওই ক্যালেন্ডারের প্রথম মাসটি খাজনা দেবার সময়রূপে নির্ধারিত ছিল। মোগল আমল থেকেই হয়তো চৈত্রের শেষ দিন দেশবাসী বকেয়া খাজনা মেটাতে শুরু করল। পয়লা বৈশাখে তাদের মিষ্টমুখ করানো হত। পরে বণিক সম্প্রদায় এই দিনটিকে অনাদায়ী ঋণ পরিশোধের দিন হিসাবে ধার্য করল। তৈরি করল লাল কাপড়ে মোড়া ‘খেরো খাতা’। তাতে নাম ধরে ধরে পাওনা-গণ্ডার হিসাব লেখা হত। ঋণ আদায় হয়ে গেলে শুভেচ্ছা বিনিময় করে মিষ্টমুখ করানো হত।

এখন প্রশ্ন, কেন পয়লা বৈশাখকে বাঙালি এবং সাধারণ মুসলমান সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছিল। কারণ হিসাবে মনে করা হয়, এই দিনটির সঙ্গে কোনও ধর্মীয় যোগ ছিল না, ছিল না কোনও হিন্দুর আচার সংস্কারগত তাৎপর্য। তাই পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, অসম, বাংলাদেশের বাংলাভাষী সমস্ত মানুষ তাতে সম্মতি দিয়েছিল। তবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করে নববর্ষে বাঙালি যে পায়েস রাঁধে, গৃহ সাজায়, আবাস পরিচ্ছন্ন করে, পিটুলি গোলার আলপনা আঁকে, পুষ্প-পাপড়ির রঙ্গোলি দেয় তা কি হাল আমলের? উত্তরে বলতে হয়, হ্যাঁ। এ সবই অর্বাচীন আমলের। বাংলার কৃষকেরা নববর্ষের দিন ভোররাতে কৃষিজমি চিহ্নিত করতে জমির সীমানায় যে পাতার আগুন জ্বালে, বাস্তুদেবতার স্মরণ-মনন করে কিংবা মুসলমানেরা যে আল্লা-রসুলকে স্মরণ করে তা একদমই পরে সংযোজিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র—

সংবর্ত ৫(২), ২০১৫ : ৩৭-৪৪।

NATARAJ TEXTILES

Mfgr:- Knitted Fabrics

129-A, Muktarambabu Street,

Kolkata - 700 007,

Telephone : 2241-8903

SHREE VENKATESH PAPER MART

"KARWA HOUSE"

64, NALINI SETH ROAD, KOLKATA-700 007

Email : svp@cal2.vsnl.net.in / svpoo7@dataone.in

Distributors :

PAPER & PAPER BOARD

Phone : 2274-5398, 2274-0889, 2274-2447, Mobile : 9830026151, Fax : 2274-2164

CAPITAL TRANSPORT CORPN. OF INDIA

H.O.

25, Gangadhar Babu Lane, Kolkata - 700 012 Phone : 2215-4312, 2236-0713

Branches:

Aligarh l Mumbai * Delhi l Durgapur * Hyderabad l Chennai * Vezianagaram

মুসলিম ধর্মান্ধতা ও বাবাসাহেব আম্বেদকর

অর্জুন গোস্বামী

ড. ভীমরাও আম্বেদকর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তথাকথিত সেকুলারবাদীরা আম্বেদকরকে সংখ্যালঘুদের (ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়) স্বার্থে নিবেদিত প্রাণ হিসেবে উল্লেখ করার বৃথা চেষ্টা করেন। যেমন মুসলমান তোষণকারী তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ এবং তথাকথিত ঐতিহাসিক সুগত বসুর একটি প্রবন্ধের উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত এই সুগত বসু এপ্রসঙ্গে আবার নৈতিকতা নিয়েও তাঁর অগাধ জ্ঞান উগরে দিয়েছেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে (৯ই ডিসেম্বর, ২০১৫) আম্বেদকর নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে 'নৈতিকতার শর্ত এই সরকার মানেনি' শীর্ষক এক প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্য ঃ ''আজ যারা দেশ শাসন করছেন, কিছুকাল ধরে সংখ্যালঘু সমাজকে তারা ভালোই বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন, তাদের পছন্দের সমাজে সংখ্যালঘুদের স্থান নেই''। তৃণমূল সাংসদ সুগত বসু ওই একই প্রবন্ধে আরও লিখছেন যে, প্রসঙ্গত ১৯৪৮ এর ৪ নভেম্বর গণপরিষদ বা কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেমব্লিতে ভারতের 'সংবিধানের খসড়াটি পেশ করার সময় ড. আম্বেদকর সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দানের প্রয়োজন নিয়ে বলেছিলেন সংখ্যালঘুদের মধ্যে যাতে কোনও অবিচারজনিত বিপন্নতার বোধ তৈরি না হয় সেটা দেখা যে সংখ্যাগুরুর দায়িত্ব, সংখ্যাগুরুকেই সেটা বুঝতে হবে।' কিন্তু সুগতবাবু সংখ্যালঘু বলতে যদি মুসলমানদের বোঝানো হয় অথবা মুসলমান (এবং খ্রিস্টান) ধর্মের বৈশিষ্ট্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা হয় তাহলে আর কেউ নন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই একটি উক্তিকে আমরা স্মরণ করতে পারি। শ্রীযুক্ত বসুকে মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে সংখ্যালঘু মানে কিন্তু উগ্রতা নয়, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে শুধু ভারতবর্ষ কেন সারা বিশ্বেই যেখানে যেখানে মুসলমানেরা সংখ্যালঘু তারা কিন্তু ধর্মীয় ক্ষেত্রে এই উগ্রতারই প্রকাশ ঘটান।

রবীন্দ্রনাথ তাই হিন্দু-মুসলমান শীর্ষক শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগকে লিখিত এক পত্রে (১৯২২ সালে লিখিত) ধর্মীয় বিষয়ে উগ্রতাটা যে অধিক মুসলমানদের মধ্যে সেই কথা বোঝাতে গিয়ে লিখেছেন—''পৃথিবীতে দুটি ধর্ম সম্প্রদায় আছে। অন্য সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়ের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র। সে হচ্ছে খ্রিস্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজেদের ধর্মকে পালন করে সন্তুষ্ট নয়। অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত। এই জন্য তাদের ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য কোন উপায় নেই।'' যে সংখ্যালঘু

হিন্দু অধ্যুষিত প্রদেশগুলিতে নির্বাচকমণ্ডলী নির্ধারণের উপরে সংখ্যালঘু মুসলমানদের যদি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকে, তাহলে মুসলমান অধ্যুষিত প্রদেশগুলিতে নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের ব্যাপারে সংখ্যালঘু হিন্দুদের সে অধিকার থাকবে না কেন? প্রশ্নটি তুলেছিলেন স্বয়ং আম্বেদকর তাঁর 'পাকিস্তান ও সাম্প্রদায়িক শান্তি' প্রবন্ধে।

স্বার্থের কথা ভেবে ভেবে আকুলিত সুগত বসু, সেই সংখ্যালঘু মুসলমানরা যে কেমন 'স্বদেশ চেতনায়' উদ্বুদ্ধ তার স্বপক্ষে আবার রবীন্দ্রনাথকেই স্মরণ করি। কবির কথা উল্লেখ করে ১৮ই এপ্রিল, ১৯২৪ সালে যে রিপোর্ট 'Times of India' তে প্রকাশিত হয়েছিল তা নিম্নরূপ ঃ

Another very important fact which according to the poet was making it almost impossible for Hindu–Mohammedan Unity to become an accomplished fact was that the Mohommedans could not confine their patriotism to any country..... the poet said that he had very frankly asked many Mohamedans whether in the event of any Mohammedan power invading India they would stand side by side with their Hindu Neighbours to defend their common land..... He said that he could definetly state that even men like Mr. Mohammed Ali had declared that under no circumstances it is not possible for any mohammedan whatever his country might be, to stand against any other Mohammedan'' (Quoted by A. Ghosh in his article ''Making of the Muslim psyche'' Manthan Quarterly Journal of the Deendayal Research Institute. New Delhi, February 1983, P. 16)

যে সংখ্যালঘুদের ধর্মের কথা বার বার উচ্চারিত হয় সেখানেও কিন্তু চরম এক বিভ্রান্তি কাজ করে। এই প্রসঙ্গে আরও একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো দেশভাগ। দেশভাগ হয়ে যাবার পর পাকিস্তান সৃষ্টির অন্যতম নায়ক অথবা খলনায়ক এবং তথাকথিত দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তা জিন্নার উক্তি—দেশ তো ভাগ হয়ে গেলো কিন্তু যে মুসলমানেরা ভারতে রয়ে গেলো তারা কী করবে? দ্বিজাতিতত্ত্বে আস্থা রেখে তারা কি বলবে আমরা পাকিস্তানি, ভারতীয় নই? কিন্তু না, জিন্নাহ ভারত ছেড়ে চলে যাবার সময় মুসলমানদের পরামর্শ দিয়ে গেলেন ভারতীয় হয়ে থাকবার জন্য। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সংখ্যালঘু মুসলমানদের কতটা অংশ নিজেদের ভারতীয় বলে মনে করেন? সুতরাং যে মুসলমানরা 'আমাদের এই মহান ঐতিহ্যময়' (সুগত বসু কথিত) দেশটাকেই অস্বীকার করতে চান তাদের বিপন্নতাবোধ রোধ করার প্রচেষ্টা কতটা সাফল্য পাবে সেটাও একটু বিবেচ্য বিষয়। এই প্রসঙ্গে স্মরণে রাখা উচিত যে, সুগতবাবুর মতো ব্যক্তিরা যেমন ভারতবর্ষের সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে ড. আম্বেদকরের বক্তব্য নিয়ে কেঁদে আকুল, ঠিক তেমনি তারা যেন ভাবিত হন বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানে যারা সংখ্যালঘু অর্থাৎ হিন্দুরা কী অবস্থায় আছেন তা অনুধাবন করতে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'পাকিস্তান ও সাম্প্রদায়িক শান্তি' বিষয়ে ড. আম্বেদকরের বক্তব্য। তিনি বলছেন— প্রত্যেক হিন্দু অবশ্যই প্রশ্ন করবেন, পাকিস্তান কি সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের সমাধান করেছে? তিনি অবশ্য এই প্রসঙ্গে ক্ষুদ্রতর এবং বৃহত্তর আঙ্গিকের কথা বলছেন যে ঃ 'গোলটেবিল বৈঠক'-এ মুসলমানদের দাবি ছিলো—

(১) সমস্ত প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভায় তাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচক মণ্ডলী হবে আলাদা।

(২) যে সমস্ত প্রদেশে সংখ্যালঘু মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধে দেওয়া হতো, তা অব্যাহত রাখতে হবে এবং তাছাড়া পঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল এবং বাংলা যেখানে তারা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে তাদের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন সুনিশ্চিত করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে ড. আম্বেদকর হিন্দু মতেরই অনুসারী হয়ে বলেছিলেন—শুরু থেকেই হিন্দুরা দুটি দাবিতেই আপত্তি তোলে। তারা সমস্ত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের জন্য জনসংখ্যার অনুপাত অনুসারে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি জানিয়ে আইন করে কোনও সম্প্রদায়কে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন সংখ্যা পাইয়ে দেওয়া সুনিশ্চিত করার তীব্র বিরোধিতা করেছে। এর পরেই ইংরেজ সরকারের প্রতি তার ক্ষোভ উগরে দিয়ে ড. আম্বেদকর বললেন—হিন্দুদের আপত্তির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় মুসলমানদের সমস্ত দাবি মেনে নিয়ে মহামহিম সরকার বাহাদুর খুব সহজ সরলভাবে এই বিবাদের নিষ্পত্তি করলেন।

শুধু তাই নয়, মুসলমানদের জন্য বিশেষ সুযোগ ও স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী এবং যেসব জায়গায় তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল সেখানে তাদের জন্য সুনিশ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনের ব্যবস্থা করা হলো। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দু অধ্যুষিত প্রদেশে সংখ্যালঘু মুসলমানরা স্বতন্ত্র নির্বাচক মণ্ডলী দাবি করেছিল। ইংরেজ সরকার সে দাবি মেনেও নিয়েছিল। কিন্তু আসল ব্যাপারটা তো হলো--- ড. আম্বেদকরের কথাতেই বলি—মুসলমান প্রদেশগুলিতে সংখ্যালঘু হিন্দুরা যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী দাবি করেছিলো কিন্তু সে দাবি অগ্রাহ্য করে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু হিন্দু অধ্যুষিত প্রদেশগুলিতে নির্বাচকমণ্ডলী নির্ধারণের উপরে সংখ্যালঘু মুসলমানদের যদি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকে, তাহলে মুসলমান অধ্যুষিত প্রদেশগুলিতে নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের ব্যাপারে সংখ্যালঘু হিন্দুদের সে অধিকার থাকবে না কেন? প্রশ্নটি তুলেছিলেন স্বয়ং আম্বেদকর তাঁর 'পাকিস্তান ও সাম্প্রদায়িক শান্তি' প্রবন্ধে।

তথ্যঋণ ঃ

ড. আম্বেদকরের Pakistan or Partition of India.

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

বিশেষ নিবন্ধ

ভারতের সংবিধান ও ড. আম্বেদকর স্মরণ

তরুণ বিজয়

কিছুদিন আগে লোকসভায় সংবিধানের ওপর বিতর্কের সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ মন খুলে বলেছেন এবং যথেষ্ট বলেছেন। তিনি আম্বেদকরের উদাহরণ টেনে আমির খানের পলায়নি মানসিকতাকে কটাক্ষ করে সংরক্ষণের পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। সে সময় সোনিয়া গান্ধীর বক্তব্য, 'যাঁরা সংবিধান নির্মাণের সময় ছিলেনই না তাঁদের সংবিধানের বিষয়ে বলার কোনো অধিকার নেই'— খুবই শিশুসুলভ মনে হয়েছিল। ভারতীয় জনতা পার্টির নেতারা সংবিধান সভার সদস্যরূপে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নাম উল্লেখ করেননি, তবু সোনিয়া গান্ধী কেন বললেন যে, আগামী ৫০ বছরে ভারতে যে প্রজন্ম আসবে তাদের সংবিধানের বিষয়ে কোনো কিছু বলার অধিকারই নেই? সংবিধানে তো হিন্দীকে সমস্ত স্তরে রাজভাষা করার কথা বলা হয়েছে। সেটা কেন সম্পন্ন হয়নি? সংবিধানের নির্দেশিকাতে গো-রক্ষার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সংবিধান তৈরির সময় তো তাদের দলের লোকেরাই ছিল— এই অহঙ্কার যাদের, তারাই কেন ভারতভূমিকে গোমাংসে কলঙ্কিত করতে উঠে পড়ে লেগেছেন? তাঁরা সংবিধান রক্ষা, না ধ্বংস করছেন? সোনিয়া সংবিধান তৈরির সময় ভারতীয় জনতা পার্টি ছিলই না বলেছেন, কিন্তু যে দলের ১৯৮০ সালে জন্ম তারা কী করে ১৯৪৯ সালে থাকবে? আর সোনিয়াজিই তখন কোথায় ছিলেন? কংগ্রেসদলই সংবিধানকে ভেঙেছে এবং তার মৌলিক অধিকারগুলোকে পদদলিত করেছে। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময় কংগ্রেসই সংবিধানের সঙ্গে ভয়ঙ্কর খেলা খেলেছে। তখন আইনের রক্ষকদের ভক্ষকে পরিণত করার প্রয়াস করা হয়েছিল।

সংবিধানে অবহেলিতদের রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ৬০ বছরের কংগ্রেসি রাজত্বের পরিণামে অবহেলিতদের ওপর আক্রমণ ও অত্যাচার ২০১৩-১৪ সালে আগের দশকের তুলনায় আড়াইগুণ বেশি হয়েছে। অনুসূচিত জাতি ও অনুসূচিত জনজাতিদের অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হয়েছে। কয়েকদিন আগে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুন জেলায় কালসি ব্লকে অবহেলিতদের মন্দিরে প্রবেশে বাধা দেওয়ার ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত হয়েছে। সেখানে এক গর্ভবতী অবহেলিত মহিলাকে মন্দিরে পূজা দেওয়ার 'অপরাধে' মারধোর করা হয়েছে এবং তাঁর স্বামীর থেকে দণ্ডস্বরূপ ৫০১ টাকা আদায় করা হয়েছে। কর্ণাটকের কোলার জেলায় রাধম্মা নামে এক অবহেলিত মহিলা বিদ্যালয়ে 'মিড ডে মিল' রান্না ও পরিবেশন শুরু করলে ১০০ জন ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে আসা ছেড়ে দেয়। মধ্যপ্রদেশের ধার জেলায় তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকেরা তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে অবহেলিত শ্রেণীর এক ব্যক্তির শবযাত্রায় বাধা দেয় এবং তাদের অন্য রাস্তা দিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়। সংবিধান ও ড. আম্বেদকরের জীবনের স্মরণ অবশ্য করতে হবে, কিন্তু তার পরিণামে আমাদের জীবনে যেন মানবিকতা ও সাম্যের আচরণ দেখা যায়।

যদি এই শতাব্দীর মহান সন্তানদের দেখার জন্য আকাশ গঙ্গায় দৃষ্টিপাত করি, তাহলে তার মধ্যে ড. ভীমরাও আম্বেদকর এমন এক উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে উদ্ভাসিত যিনি মানবতা এবং সমরস সমাজের রক্ষার জন্য অসাধারণ ও অভূতপূর্ব কাজ করেছেন।

শ্যামাপ্রসাদ, নেহরু, সর্দার প্যাটেল প্রমুখদের সঙ্গে আম্বেদকর।

"Om"

M/S. RAJ KUMAR BROTHERS
M/S. R. K. BROTHERS

IRONSTEEL, HARDWARE MERCHANTS
COMMISSION AGENT & GENERAL ORDER SUPPLIERS

STOCKIST OF :-

M.S WIRE ROD/ TMT, TATA HB, ANEALED & G.I. BARBED CONCERTINA WIRE, WIRENETTING & CHAIN LINK, WIRE NAILS, K.K. NAILS, PANEL PINS, TARFELT, BOLT NUTS & RIVETS, PLASTIC (POLYTHENE), PVC, GI, CORRUGATED SHEET, ELECTRODES & AGRICO TOOLS ETC.

167, Netaji Subhash Road, (Raja Katra), Kolkata-700 007
9330001340, 22580040/41
email : susilbagaria@yahoo.in

With Best
Compliments From :-

Rajesh
Kankaria

Importers of :
EARTHMOVING SPARES & CHAINS

EXPRESS TRADING AGENCIES

P-41, PRINCEP STREET (Ground Floor)
KOLKATA - 700 072

PHONE : Offi. - 3028-4043, 2237-9159.
Fax. - 91-33-2225 8494

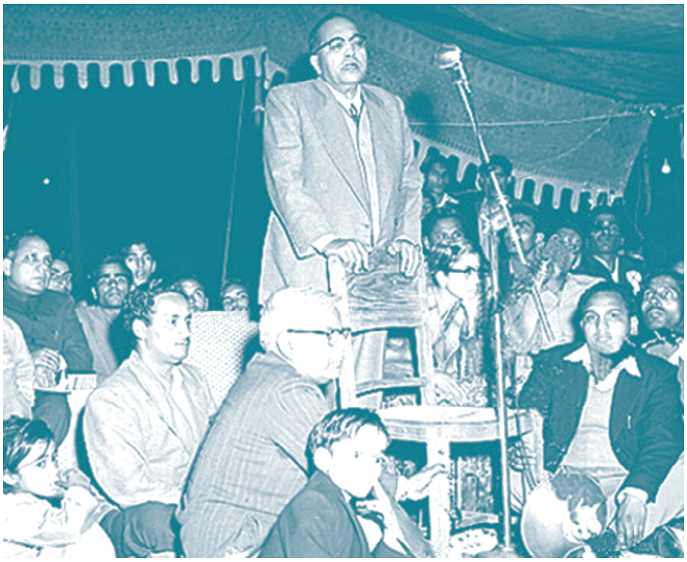

দিল্লির এক জনসভায় আম্বেদকর (ভাষণরত)।

একটু কল্পনা করুন, এক চতুর্থাংশের বেশি জনসমুদায়কে শতাব্দীব্যাপী কত অন্যায়, অবিচার ও উপেক্ষার শিকার হতে হয়েছে! এইজন্য স্বামী বিবেকানন্দকে বলতে হয়েছিল যে, মহান দর্শন ও শাস্ত্র থাকতেও আমাদেরই ধর্মবন্ধুদের প্রতি আমরা যেরূপ ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেছি তাকে ধিক্কার জানানোর ভাষা নেই। স্বামীজী এই ভাব থেকে যে স্বদেশমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন তাকে মূর্ত রূপ দিয়েছেন ড. আম্বেদকর, সংবিধানে অনুসূচিত জাতির জন্য বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। আমি অবাক হয়ে যাই যে, ড. আম্বেদকর সংবিধানের মাধ্যমে যে ঐতিহাসিক সাম্যের অধ্যায় রচনা করেছেন, সেটা ব্যতীত আমরা কি সংসদ ও বিধানসভাগুলিতে, বিজ্ঞান ও চিকিৎসাক্ষেত্রে, ইঞ্জিনিয়ারিং ও তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে এত বিশাল সংখ্যায় তেজস্বী ও বিশ্বের মুখ উজ্জ্বলকারী নব যুবা প্রজন্মের দেখা পেতাম? সংবিধানের সেই বিশেষ ধারার ফলে তারা শতাব্দীর বন্ধন ভেঙে এক নতুন সমরস সূর্যের উদয় সম্ভব করেছে। এটা এক অপ্রিয় সত্য যে, আজও দেশের বিভিন্ন অংশে অবহেলিত শ্রেণীর ওপর অত্যাচারের ঘটনা ঘটে চলেছে। আমাদের সঙ্কল্প নিতে হবে যে, সমস্ত অবহেলিত ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণীকে সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করতে হবে। জাতিগত কারণে একটিও যদি অত্যাচারের ঘটনা ঘটে তাহলে দুনিয়ার সামনে ভারতের মাথা হেঁট হয়ে যাবে।

অনুসূচিত শ্রেণীর বিকাশের ক্ষেত্রে আমাদের স্বপ্ন যে, তারা এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয় যাতে সাহায্য পাওয়ার দল থেকে সরে এসে সাহায্য দেওয়ার দলে উন্নীত হয় এবং রোজগার প্রদাতা রূপে গৌরব অর্জন করে। ড. আম্বেদকর সংবিধানের মাধ্যমে অবহেলিত শ্রেণীর জন্য যে ধারা নির্মাণ করেছেন, তার গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি এমন একটি ভিত্তি স্থাপন করেছেন যা গান্ধীজী ও নেলসন ম্যান্ডেলার ভাবনাকে আরও এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সংবিধানের বিশেষ ধারায় অনুচ্ছেদ-১৫ সর্বপ্রকার ভেদভাবের রক্ষাকবচ এবং অনুচ্ছেদ ১৬ ও ১৭ ধারা সর্বজনীন রোজগারের ক্ষেত্রে সমানতার অধিকার দেয় ও অস্পৃশ্যতাকে কঠোর নিন্দা করে।

সংরক্ষণ অবহেলিত শ্রেণীকে সাম্য প্রদানের গৌরব ও আত্মবিশ্বাস প্রদান করার এক রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান, যা ব্যতিরেকে বর্তমানে আমরা তাদের বিকাশ দেখতে পেতাম না। জাতির ভিত্তিতে বৈষম্য সমাপ্ত করার অনেক প্রয়াস হয়েছে। ছত্রপতি শাহুজী মহারাজ থেকে শুরু করে ড. আম্বেদকর পর্যন্ত এক দীর্ঘ পরম্পরা রয়েছে। কর্ণাটকের উডুপী মন্দিরের ঘটনা যাতে ভগবান তাঁর এক অবহেলিত ভক্তকে দর্শন দেওয়ার জন্য মন্দিরের দেওয়াল ভেঙে পিছন ফিরে সমরসতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। বাস্তবিকই এই ঘটনা এই দেশের মূল বার্তা।

আসলে মন বদল করতে হবে। সামাজিক ভেদভাবের শিকার যারা, পুস্তক ও প্রবচনের চেয়ে নিজের মধ্যে তাদের উপস্থিতি অনুভব করে ভাবতে হবে। নিজের জন্য বা নিজের ছেলেমেয়ের জন্য কোনো স্কুলে বা কর্মক্ষেত্রে আমরা কি ভেদভাব সহ্য করতে পারি? নিজে যে ব্যবহার আশা করি না, তা অন্যের প্রতি কেন করতে চাই? নিজ অন্তরে ও আচরণে এই সমভাব আনতে পারলেই সংবিধান ও ড. আম্বেদকরকে স্মরণ যথার্থ হবে।

(লেখক একজন প্রাক্তন সাংসদ এবং প্রবীণ সাংবাদিক)

লেখাটি পুনঃপ্রকাশিত হল।

With Best
Compliments From :-

A
Well Wisher

প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র সংগীতজগতে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে

অমিত ঘোষ দস্তিদার

প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। মনের অনুভূতিকে ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে মানবশরীরের যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাদ্যযন্ত্রের কাজ করে সেগুলি হলো—আঙুল, হাতের চেটো, পা, হাত, জিভ, ঠোঁট, গাল, বগল ইত্যাদি। অনেকের মতে সঙ্গত বাদ্য আগে, পরে সঙ্গীত। গীত বা গায়ন, বাদ্য বা বাদন ও নৃত্য এই তিন কলার জন্যই বাদ্যের বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশ হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। যথা— (১) তৎবাদ্য— যেসব বাদ্যযন্ত্রে তার থেকে ধ্বনি উৎপত্তি হয় তাকে তৎবাদ্য বলে। তৎবাদ্য দু'রকম। যথা— (ক) তৎবাদ্য, (খ) বিতৎবাদ্য। যেসব তারবাদ্যযন্ত্রে অঙ্গুলি, মিজরার দ্বারা আঘাতের ফলে ধ্বনির উৎপত্তি হয় তাকে তৎবাদ্য বলে। যেমন— বীণা, সেতার, তানপুরা, সরোদ ইত্যাদি। যেসব তারবাদ্যযন্ত্রে ছড়ি বা ছড় বা ধনু দ্বারা আঘাত বা ঘর্ষণের ফলে ধ্বনির উৎপত্তি হয় তাকে বিতৎবাদ্য বলে। যেমন— বেহালা, সারেঙ্গী, দিলরুবা ইত্যাদি। (২) সুশির বাদ্যযন্ত্র— যেসব বাদ্যযন্ত্র বাঁশ, কাঠ অন্যপ্রকার ধাতব পদার্থ দিয়ে বানানো হয় এবং হাওয়া, মুখের ফুঁ দ্বারা ধ্বনির উৎপত্তি করা হয় তাকে সুশির বাদ্যযন্ত্র বলে। যেমন— সানাই, বাঁশি, বেণু ইত্যাদি। (৩) অনবদ্ধ বা আনদ্ধবাদ্য— যেসব বাদ্যযন্ত্র চামড়া দ্বারা আচ্ছাদিত এবং চামড়ার উপর আঘাতের ফলে ধ্বনির উৎপত্তি হয় তাকে অনবদ্ধ বা আনদ্ধ বাদ্য বলে। যেমন— শ্রীখোল, তবলা-বাঁয়া, মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ ইত্যাদি। (৪) ঘনবাদ্য— যেসব বাদ্যযন্ত্র ধাতুনির্মিত অর্থাৎ পিতল, কাঁসার তৈরি, ধাতুগত আঘাতের ফলে ধ্বনির উৎপত্তি হয় তাকে ঘনবাদ্য বলে। ঘনবাদ্য দু'রকমের— অনুরক্ত এবং বিরক্ত। যে ঘনবাদ্য সঙ্গীতে ব্যবহার করা হয় তা হলো অনুরক্ত। যেমন— করতাল, মন্দিরা, জলতরঙ্গ ইত্যাদি। যে ঘনবাদ্য পূজানুষ্ঠান ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয় তা বিরক্ত। যেমন— ঘণ্টা, কাঁসর ইত্যাদি।

ভারতীয় দেবদেবী এবং ঋষিদের একান্ত নিজস্ব কিছু বাদ্যযন্ত্র রয়েছে। অনেক বাদ্যযন্ত্রের তাঁরা আবিষ্কারক। যেমন— সরস্বতীর বাদ্যযন্ত্র কচ্ছপী বীণা। শিবের বাদ্যযন্ত্র— ডমরু, ঘটম্, মৃদঙ্গ, বীণা, পঞ্চমুখবাদ্য, গণেশের বাদ্যযন্ত্র হলো— মৃদঙ্গ। অনেকে গণেশকে মৃদঙ্গের আবিষ্কর্তা বলে থাকেন। কৃষ্ণের বাদ্যযন্ত্র— বাঁশী, বেণু, শঙ্খ। নারদের বাদ্যযন্ত্র— মহতী বীণা। তম্বুর মুনির বাদ্যযন্ত্র— তানপুরা। তাঁকে তানপুরার আবিষ্কর্তা বলা হয়।

বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ, বেণু, ঘটম্, ডমরু ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রে অতি প্রাচীনতার দাবি রাখে। এছাড়া ভারতের প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত চলে আসা বাদ্যযন্ত্রগুলি হলো—আঙ্কিক, মৃদঙ্গম, পণব, গোপুচ্ছ-মৃদঙ্গ, হরীতকী আকৃতি মৃদঙ্গ, যবাকৃতি মৃদঙ্গ, দর্দুর, উর্ধক, সূর্যপিরাই, চন্দ্রপিরাই, ডফ, ইড়ক্কা বা এডক্কা, গ্ল, কুডমুজ্ঝ্, ঘুমত বা গুন্মতি, নাগারা, শুদ্ধমড্ডলম, ছেন্ডা, উরুমি, পাম্বাই, উড়ুক্ক বা হুড়ক্ক, তুম্বকনরি, তিমিলা, তাটুকাঝি, নাগেশ্বরম্, তানপুরা, মন্দিরা, ঘুঙুর, দুন্দুভি, দামামা, ধনু-টঙ্কার, শঙ্খ, বেণু, পাখোয়াজ, খোল, ঢোল, তন্তিল, সুরবাহার, কলতাল, রবাব, সন্তুর, সানাই, সেতার, সারিন্দা, শ্রীখোল, খঞ্জনী, ঢোলক, ঢাক, একতারা, দোতারা, আনন্দলহরী, কাঁসর, কাষ্ঠতরঙ্গ, কম্পাশুক্তি, পট্টাদি, ধামসা, খমক, মাদল কাঁসি, কাণ্ডি ইত্যাদি।

বিদেশি বাদ্যযন্ত্র যা এখন ভারতের অতি আপন— বেহালা, গিটার, ক্ল্যারিওনেট, ব্যাগপাইপ, হারমোনিয়াম, সরোদ ইত্যাদি। প্রাচীন ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র থেকে বর্তমান দেশি—বিদেশি বাদ্যযন্ত্রগুলি হলো— ভেরী বা দুন্দুভি থেকে নাগারা বা নাক্কাড়া। মৃদঙ্গ থেকে শ্রীখোল, মৃদঙ্গম্, পাখোয়াজ। পাখোয়াজ থেকে তবলা-বাঁয়া। পিণাকী বীণা থেকে সারেঙ্গী। সেতার এবং সারেঙ্গী সংমিশ্রণে— এস্রাজ, দিলরুবা। সরোদ থেকে বর্তমানকালের দোতারা। রুদ্রবীণা থেকে রবাব, সরোদ। চিত্রাবীণা থেকে সেতার। কচ্ছপীবীণা থেকে সুরবাহার। আবার অনেকের মতে বীণা এবং সেতার থেকে সুরবাহার। ধনুবাদ্যযন্ত্র থেকে বেহারা, এস্রাজ, সারেঙ্গী। বাঁশী, বেণু ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র থেকে হারমোনিয়াম, ক্ল্যারিওনেট, ব্যাগপাইপ ইত্যাদি।

বৈদিক যুগের ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র— ক্ষৌণী, আঘাটি, ঘাটলিকা, কাণ্ডবীণা, পিচ্ছোরা, শততন্ত্রী, বাণবীণা, ঔদুম্বরী-বীণা, দপ্তবীণা, গুঁসাপের চামড়া থেকে তৈরি গোধবীণা, বেত দিয়ে তৈরি কাণ্ডবীণা, দামামা, ডমরু, দুন্দভি। হরিবংশ যুগের প্রচলিত বাদ্যযন্ত্র— তুম্ববীণা বল্লকী, মৃদঙ্গ, তূর্য, ভেরী, শঙ্খ, বেণু, বীণা,

পণব, ঝর্ঝরী, ডিন্ডিম ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের মনোহরণের জন্য যদুবংশীয় পুরুষ এবং নারীরা নৃত্যে এবং গীতে— বীণা, মৃদঙ্গ, বেণু প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করতেন। রামায়ণ যুগের বাদ্যযন্ত্র— তন্ত্রবীণা, বিপঞ্চুবীণা, চিত্রাবীণা, বেণু, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, স্বস্তিক, ঘণ্টা ইত্যাদি। মহাভারতের যুগের বাদ্যযন্ত্র— মুরলী, শঙ্খ, ধনুযন্ত্র ইত্যাদি। বৌদ্ধযুগের বাদ্যযন্ত্র— সপ্ততন্ত্রী বীণা, তূর্য, কুম্ভস্থুণ, ভেরী, শঙ্খ ইত্যাদি। গুপ্তযুগের বাদ্যযন্ত্র— তৎ, আনদ্ধ, ঘন এবং সুশির শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্র। সমুদ্রগুপ্ত বীণাবাদনে অসামান্য পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। মধ্যযুগে পণ্ডিত অহবোল রচিত 'সঙ্গীত পারিজাত'-এ উল্লেখিত বাদ্যযন্ত্র : তন্ত্রীবাদ্য— ভৌম্বুর বা তানপুরা, দণ্ডী। অনদ্ধবাদ্য— মৃদঙ্গ, দুন্দুভি, ভেরী, রুজ্ঞা, ডমরু, পটহ, কুডুক্কা, হুড়ুক্কা, ঢক্কা, রবাবহ, নাগসর, মুখবীণা, বক্রী, চঙ্গু, জলযন্ত্র, জলতরঙ্গ। শাঙ্গদেবের সময়ের বাদ্যযন্ত্র : আব্‌জা বা হুডুক্কা, স্কন্ধাবজ বা হুন্ডুক্কা, আড্ডাবাজ বা দেশিপটহ, পুষ্কর। ভরতমুনির সময়ের বাদ্যযন্ত্র : উর্ধ্বক, বামক, দক্ষিণ দদুর। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখিত বাদ্যযন্ত্র : সাততার বিশিষ্ট চিত্রবীণা এবং নয় তার বিশিষ্ট বিপঞ্জীবীণা, এছাড়া অন্যান্য তৎ, আনদ্ধ, সুশির, ঘনবাদ্যযন্ত্র।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র : রাজস্থান— ঘেরা, ঢোল, ঘুঙুর, পাখোয়াজ, তানপুরা, মুখবীণা (ভূর্জপত্র) ইত্যাদি। ত্রিপুরা— রোসেম। মণিপুরের— ওসেম, তিং তেইল্লা। অসম— হুটুটু। কাশ্মীর— তুম্বকনরি, সন্তুর, তানপুরা, পায়োয়াজ, তবলা ইত্যাদি। মেঘালয়— সিং নাকড়া। কেরালা— তম্বুর, নাগেশ্বরম্, তিমিলা, এড্ডকা, পাম্বাই, তাটুকাঝি, ঘটম্, মৃদঙ্গম্, ইড়ক্কা ইত্যাদি। তামিলনাড়ু— টম্পাট্টাই, তারপুরা, মৃদঙ্গম্, জামুক্কু ইত্যাদি। কর্ণাটক— গুম্মতে, হালিগে ইত্যাদি। ঝাড়খণ্ড— ভূয়াং, ঢাক ইত্যাদি। অন্ধ্রপ্রদেশ— বুর্‌রা, তানপুরা, পাখোয়াজ। মহারাষ্ট্র— ঘুমত, হালিগে। গোয়া— গুম্মতি, পাখোয়াজ, গিটার। বাংলা— একতারা, দোতারা, বাঁশী, বেণু, আনন্দলহরী, ঢাক, শ্রীখোল, করতাল ইত্যাদি।

ভারতীয় নৃত্যে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র— মণিপুরী নৃত্যে ব্যবহৃত— পুং (নটপালা), পুং (বংদেশ পালা), হারাউপুং, ধলক, খোল, খঞ্জরী, দফৎ, ঢোল, রামতাল, মন্দিলা, মাঙ্গভ, করতাল, ঝাল, শেম্বুং, বাঁশী, মোইবুং, পেনা, এসরাজ, তানপুরা ইত্যাদি। দক্ষিণভারতীয় লোকনৃত্যে—পাম্বাই। কেরলের কথাকলি নৃত্যে—শুদ্ধমড্ডলম্, ছেণ্ডা। কুচিপুড়ী নৃত্যে—ঘুঙুর। ওড়িশার শাস্ত্রীয় নৃত্যধারার বাদ্যযন্ত্র— বীণা, বাঁশী, মাদল, করতাল ইত্যাদি। মোহিনীঅট্টম্ নৃত্যে— এডাক্য, ঢোল। কত্থক নৃত্যে—পাখোয়াজ, মৃদঙ্গ, তবলা, নাগমা, সারেঙ্গী, সেতার, সরোদ, বাঁশি। ভরতনাট্যম্ নৃত্যে— নাগেশ্বরম্, ঘুঙুর, মৃদঙ্গ, বীণা, বেহালা, বাঁশী, ঘটম্, তানপুরা, মন্দিরা। বাংলার লোকনৃত্য— পুরুলিয়ার ছৌনাচে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র— ঢাক, ঢোল, ধামসা, সানাই, কাঁসর। সাঁওতালি নৃত্যে— মাদল, মন্দিরা, ধামসা, ঘুঙুর। রায়বেশ নৃত্য— বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদের রায়বেশ নৃত্যের বাদ্যযন্ত্র— বড় ঢাক, ঢোল, কাঁসি। ছালী নৃত্য— কলকাতার বেহালার ঢালীপাড়া এবং বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত ঢালী নৃত্যের বাদ্য— ঘুঙুর, ঢোল, কাঁসি। গাজন উৎসবের নৃত্যবাদ্য—হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গাজন উৎসব নৃত্যে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র— ঢাক, কাঁসি। গম্ভীরা নৃত্য— উত্তরবঙ্গের মালদহের প্রচলিত নৃত্যে মুখোশ- সহ ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র— ঢাক, ঢোল, কাঁসি। রবীন্দ্র নৃত্য বা নৃত্যনাট্য— শ্রীখোল, মৃদঙ্গ, কাঁসি, একতারা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে হয়।

বিভিন্ন ভারতীয় গানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলি হলো : খেয়াল গানে— তানপুরা, সেতার, তবলা। ধ্রুপদ ধামারে— পাখোয়াজ। কীর্তন গানে— খোল, খঞ্জনী, করতাল। ভাবসঙ্গীতে— মন্দিরা অপরিহার্য বাদ্যযন্ত্র— তুম্বকনরি। দক্ষিণভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে— তভিল, মৃদঙ্গম্। উত্তর ভারতের সঙ্গীতে— পাখোয়াজ। রবীন্দ্রসঙ্গীত— খোল, তবলা, তানপুরা সেতার। বাংলার পল্লীগীতি— দোতারা, একতারা, আনন্দলহরী, তবলা। বাউল গান— একতারা, ঘুঙুর, ক্ষমক। ঝুমুরগান— মাদল, বাঁশি। সাঁওতালি গান— মাদল, ধামসা, মন্দিরা। কবিগান— ঢোল, কাঁসি। ভাদু ও টুসুগান— ঢাক, ঢোল।

সঙ্গীত সম্রাট তানসেন রবাব এবং রুদ্রবীণা নামক দুটি তৎ শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্রের স্রষ্টা। আমীর খসরু সেতারের আবিষ্কর্তা। তিনি পাখোয়াজকে দুই ভাগে বিভক্ত করে তবলা-বাঁয়া সৃষ্টি করেন। ওউস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ চন্দ্রসারঙ্গ বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কর্তা। তিনি সরোদ বাদ্যযন্ত্রটির উন্নতি সাধন করে বর্তমান রূপ দিয়েছেন। বড়েগুলাম আলি খাঁ তাঁর খেয়াল গানে সুরমণ্ডল বাদ্যের মতো নিজের আবিষ্কৃত বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করতেন, যন্ত্রটির নাম— বাদ্যকানুন।

দিল্লিতে বাদ্যযন্ত্রের মূলত ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের সংগ্রহশালা আছে। কলকাতায় যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র-সংগ্রহশালা আছে, সেগুলি হলো— বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, আশুতোষ সংগ্রহশালা, লোকগ্রাম, বিধাননগর পূর্ণাঙ্গ বাদ্যবীথিকা (এখানে বাদ্যযন্ত্রের উপর তথ্যচিত্র দেখানোরও ব্যবস্থা আছে)।

তথ্যসূত্র :—

ভরতনাট্যম্— আদিত্যমিত্র। রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রশ্নোত্তরে— শম্ভুনাথ ঘোষ। ষড়জপঞ্চম— শ্রীমতী নিবেদিতা কোসর। সঙ্গীততত্ত্ব— দেবব্রত সঙ্গীতপ্রভাকর। রবীন্দ্র প্রসঙ্গ—ওই। তবলার ইতিবৃত্ত— শম্ভুনাথ ঘোষ। সঙ্গীত সাফল্য— ড. স্বপন নস্কর। সঙ্গীত দর্শিকা— ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। আ.বা.প.— ২২.০৮.২০১৬।

With Compliments From-

MARCO POLO PRODUCTS (P) LTD

nmc JAS-ANZ NEUTRAL VERITAS TRANSPARENT

NANDA MILLAR COMPANY

Engineers s Consultants
Manufacturers s Exporters

1/2, Chanditala Branch Road,
(Near Behala Chandi Mandir)
Kolkata - 700 053, India
Phone : 24030411
Mobile : 98300 78763, Fax : 91-33-24030411
E-mail : nmc@nandagroup.com
Web Site : www.nandagroup.com

With Best Compliments From :

Wadhwana

"Park Center"
24, Park Street,
Kolkata - 700016
Phone :2229-8411/1031/4352
Ph. 2229-0492
e-mail : wadhwana@vsnl.com

With Best Compliments From :

M/s. OUTBOX CARGO SERVICES LLP

SAGAR ESTATE BUILDING
2, N.C. DUTTA SARANI
ROOM NO. 2, 3RD FLOOR
KOLKATA - 700001
KAMAL AGARWAL
Contact No.
M : 98300 23126
O : 91-33-40033326 / 40055518
Fax : 91-33-2230-6490
e-mail : info@outboxcargo.com

চিঠিপত্র

বিজেপির রণনীতি

সদ্য সমাপ্ত উলুবেড়িয়া লোকসভার উপনির্বাচনের রায়ে স্পষ্ট, হিন্দুপ্রধান এলাকায় বিজেপি ভালোরকম ভোট পেলেও মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে ফল হতাশাজনক। তৃণমূল পেয়েছে ৬১.৫৭ শতাংশ। বিজেপি সেখানে ২৩.৫০ শতাংশ। প্রথম স্থানাধিকারীর তুলনায় দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর নাম্বার এতটাই কম যে দ্বিতীয় হওয়াতে কোনও গৌরব নেই। সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। তাই এই বিষয়ে কীভাবে ভালো করা যায় তার জন্য মুসলমান বুদ্ধিজীবী, ইমাম, হাজি, মৌলবিদের নিয়ে বসতে চলেছে রাজ্য বিজেপি বলে খবর। কিন্তু তাতে যে শেষ পর্যন্ত ভোটের চিঁড়ে ভিজবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তার জন্য ভোটবিশেষজ্ঞ বা সমাজতত্ত্ববিদ হবার দরকার নেই, মাঝে মাঝে ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে দাঁড়ালেই হবে, বোধগম্য হবে বিজেপি সম্পর্কে তাদের ভাবনা-চিন্তা। আট থেকে আশি সকলেই মমতা-অন্তপ্রাণ। তাদের কাছে, বিজেপি মানে নরেন্দ্র মোদী, নরেন্দ্র মোদী মানে মুসলমান বিরোধী এবং গুজরাট দাঙ্গা। তাই পশ্চিমবঙ্গে মমতাদিদি যতদিন আছেন ততদিন তাদের কোনও চিন্তা নেই।

ইমাম-মুয়াজ্জিনরা মাসটি গেলে মাসোহারা পাচ্ছেন। তাদের ছেলে-মেয়ে স্কুলে গেলেই বছরে এক থোক টাকা পাচ্ছে, স্কলারশিপ বাবদ। তা সে রেজাল্ট যেমনই হোক না। মমতাদিদি তো তাদের জন্য পৃথক হাসপাতালও করতে চেয়েছিলেন, সাংবিধানিক গেরোয় তা আটকে গেল— এই যা। রমজান মাসে কী নিষ্ঠার সঙ্গেই না তিনি রোজা রাখেন! আদবকায়দায়, কেতায় পুরোদস্তুর মুসলমানদের মতো দেখায়। মুখে অনবরত ইনশাল্লাহ্ ইনশাল্লাহ আওড়ান। রামধনুকে রং ধনু করে দিয়েছেন, স্কুলের বইয়ে রাবেয়া রহিম নামের ছড়াছড়ি। দাঙ্গাও (একতরফা) তো হয় মাঝেমধ্যেই। যেমন ধূলাগড়ে হলো, সাঁকরাইলে হলো, দেগঙ্গায়, মল্লারপুর, ইলামবাজারে হলো। কিন্তু মমতাদিদির পুলিশ বেছে বেছে হিন্দুদের ধরেছে, কই, মুসলমানদের তো সেভাবে ধরপাকড় করেনি, মুসলমান জওয়ান ছেলেরা বুক উঁচিয়ে মাথা তুলে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই অবস্থায় কে এমন বেওকুফ আছে যে মমতাদিদিকে ভোট না দিয়ে হিন্দুত্ববাদী বিজেপিকে ভোট দেবে, জেনে শুনে গর্দান দেয় আর কি!

ঘটনা হলো, পশ্চিমবঙ্গে কী তারা যে ভোট পায়, সেটা তাদের গায়ে হিন্দুত্ববাদীর তকমাটা আছে বলেই। ভারতবর্ষে সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে হিন্দুরা 'টেকেন ফর গ্রান্টেড', কিন্তু বিজেপি তা নয়। এমন নয় বিজেপি বেছে বেছে হিন্দুগ্রামে উন্নয়ন করে, মুসলমান গ্রামে করে না। কিন্তু সমস্ত রাজনৈতিক দলের মতো বিজেপি তোষণে বিশ্বাসী নয়। আজ যদি বিজেপিও 'ধর্মনিরপেক্ষ' হওয়ার সাধনায় ব্রতী হয় তাহলে মুসলমান ভোট তো মিলবে না, বরং তার 'স্টেডি' হিন্দু ভোটও হাতছাড়া হবে। সেখানে বিজেপির পুনর্মুষিক হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। তাহলে করণীয় কী? এদেশের জল হাওয়াতে দুর্নীতি বড়ো ইস্যু হয় না। এসব নতুন নয়। পণ্ডিত নেহরুর আমল থেকেই আর্থিক দুর্নীতি হয়ে আসছে। জনগণের এসব গা-সওয়া। তাদের বুলিই হলো— লঙ্কায় যে যাবে সে নাকি রাবণ হবে। ভোটাররা কেবল রুটিরোজগার নিয়ে ভাবিত। কমিউনিস্টদের ভাষায় 'জীবন-জীবিকা'। পশ্চিমবঙ্গের মতো পশ্চাদপদ একটি রাজ্যে এইটি বড়ো ইস্যু হতে পারত। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর ছবিতে মানে উন্নয়নের বিজ্ঞাপনে ফাঁকা জায়গা বলতে আর অবশিষ্ট কিছু নেই। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উন্নয়ন কোথায়? ঋণের বোঝা যে ঊর্ধ্বমুখী। শিল্প কোথায়, কলকারখানা কোথায়? চিমনি থেকে ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে? কত লাখ ছেলেমেয়ে চাকরি পেল? প্রকৃত সংখ্যাটা জানা জরুরি। চাকরি বলতে তো টেট। তাও সেখানে ন' লাখ, এগার লাখের গল্প। প্রতি মাসেই একটা করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বছরে একটি কারখানা হচ্ছে না কেন? বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ ডিগ্রি হাতে বেরিয়ে আসা তরুণ-তরুণী জীবনের রসদ কোথা থেকে সংগ্রহ করবে? উন্নয়নের ঢাক তো কেষ্ট মণ্ডলের ঢাকের মতো চড়াম চড়াম করে বাজছে। এই শ্রীবৃদ্ধি সামান্য ছিঁটে ফোঁটা থেকে রাজ্যসরকারি কর্মচারীরা বঞ্চিত কেন?

'দুর্জয় ঘাঁটি' কিনা জানি না, তবে পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের চরিত্র ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পৃথক। বঙ্গীয় ভোটারদের মোহ সহজে যায় না। দীর্ঘদিন ধরে একদলীয় শাসন এখানকার ঐতিহ্য। মোহমুদ্গারের ভূমিকায় বিজেপিকে উন্নীত হতে হলে সবার আগে চাই জয়ের ক্ষুধা, ক্ষমতার ক্ষুধা ও হিন্দুত্বের সঙ্গে উন্নয়নের দিশা, কলেজ-কারখানা-কৃষির বিকাশ। অবশ্যই এটি কঠিন কাজ। কিন্তু ভিন্ন পথও তো দেখছি না। ব্যাটে বোলিংয়ে ফিল্ডিংয়ে তিনটি ক্ষেত্রেই ভালো খেলতে হবে। নইলে, এই রাজ্যের ভবিষ্যৎ নেই। রাজ্যটি খুব দ্রুত ভরে যাবে বেকারে দুর্বৃত্তে অনুপ্রবেশকারীতে।

—**উজ্জ্বলকুমার মণ্ডল,**
শেওড়াফুলি, হুগলি।

ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিম লিগ!

সম্প্রতি দিল্লিতে সোনিয়া গান্ধীর বাসভবনে সাম্প্রদায়িক বিজেপিকে পরাস্ত করার জন্য অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ ১৯ দলের এক বৈঠক হয়ে গেল, তাতে মুসলিম লিগের নামও দেখলাম। স্বাধীনতার পূর্বে ১৬ আগস্ট ১৯৪৬ সালে ডাইরেক্ট অ্যাকশানের আগে মুসলিম লিগের একটা প্রচার পত্রের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। প্রচার পত্রের পাশে ছিল খোলা তরবারি হাতে জিন্নার ছবি।

''স্বর্গেও ইসলামের তরবারি সূর্যকিরণের ন্যায় জ্বল জ্বল করবে। আমরা মুসলমানরা রাজ মুকুট পরে দেশ শাসন করেছি, অতএব, হে মুসলমান ভাইরা উৎসাহ হারিয়ো না, প্রস্তুত হও, অস্ত্র হাতে তুলে নাও। একবার ভেবে দেখ আজ আমরা

কাফেরদের অধীন। হে কাফেরগণ, সুখ বা গর্ব অনুভব কোরো না। তোমাদের শেষ বিচার দুরে নয়, তোমাদের ধ্বংস ঘনিয়ে আসছে, আমাদের হাতের তরবারি দ্বারা আমরা তোমাদের জয় করবো। ...হে মুসলমানগণ যারা গুণ্ডা চরিত্রহীন, বেনামাজ তারাও এসো তোমাদের জন্য বেহেস্তের দরজা খোলা আছে। এসো পাকিস্তান আদায়ের জন্য মুসলমান জাতির জয়ের জন্য যেসব সেনারা জেহাদ শুরু করেছে। আমরা তাদের সঙ্গী হই ও আল্লার দরবারে মোনাজতে করি।" প্রচারপত্রে আরও বলা হয়— (১) পাকিস্তান জয়ের পর সারা ভারত জয় করতে হবে। (২) ভারতের সব মানুষকেই ইসলাম ধর্মান্তরিত করতে হবে। (৩) হিন্দুনারী ও মেয়েদেরকে ধর্ষণ করবে, লুঠ করবে ও ইসলামে ধর্মান্তরিত করতে হবে ইত্যাদি।

জুন ১৯৪৭ সালে মুসলিম লিগনেতা ফিরোজ খাঁ নুন হুঙ্কার দিয়ে বলেছিলেন— "ব্রিটিশরা যদি আমাদের হিন্দু রাজত্বের অধীনে করে দিয়ে যায় তো আমরা ব্রিটিশদের জানিয়ে রাখছি এদেশের মুসলমানেরা এমন ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান করবে যা চেঙ্গিস খানের কীর্তিকেও নিষ্প্রভ করে দেবে।"

—**রবীন্দ্রনাথ দত্ত,**
কলকাতা-৬৪।

ধর্মান্তরকরণ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে হিন্দু সংহতির সভায় শিলচরের বাসিন্দা হুসেন আলি সপরিবারে হিন্দুধর্ম গ্রহণের কথা জানান। ওই ধর্মান্তর প্রসঙ্গে সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় একটি বাংলা দৈনিকে (১৫/২) বলেছেন— হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরকরণ হয় বলে আমার জানা নেই। ফলে এরকম কিছু ঘটে থাকলে সেটা খুবই বিস্ময়কর। শীর্ষেন্দুবাবুর মনে হয়, জানা নেই, ধর্মান্তরকরণ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ কী বলেছেন।

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে এক আলোচনা সভায় একটি প্রশ্ন ছিল— অহিন্দুকে হিন্দুধর্মাবলম্বী করা কি হিন্দুধর্মের মূলভাবের অবিরোধী? প্রশ্নের উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন— 'অহিন্দুকে হিন্দু করা হিন্দুধর্ম আপত্তিকর জ্ঞান করেন না'— ('স্বামীজীর সহিত মাদুরায় এক ঘণ্টা'--- স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা; নবম খণ্ড)।

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর প্রতিনিধি অন্যধর্মাবলম্বীকে হিন্দুধর্মে আনা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের মতামত জানার জন্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর জিজ্ঞাসা ছিল— যারা হিন্দুধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছে, তাদেরকে হিন্দুধর্মে পুনর্গ্রহণ করা যায় কিনা। বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছেন— 'নিশ্চয়। তাদের অনায়াসে গ্রহণ করা যেতে পারে, করা উচিতও।' এবং বলেছেন— 'তাদেরকে পুনর্গ্রহণ না করলে আমাদের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাবে। যখন মুসলমানরা এদেশে প্রথম এসেছিলেন, তখন প্রাচীনতম মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে ভারতে ৬০ কোটি হিন্দু ছিল, এখন আমরা বিশ কোটিতে পরিণত হয়েছি। আর, কোনও লোক হিন্দুসমাজ ত্যাগ করলে সমাজে শুধু যে একটি লোক কম পড়ে তাই নয়, একটি করে শত্রু বৃদ্ধি হয়।

'তারপর আবার হিন্দুধর্ম ত্যাগ মুসলমান বা খ্রিস্টানদের মধ্যে অধিকাংশই তরবারিবলে ওই সব ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে, অথবা যারা ইতিপূর্বে ওইরূপ করেছে, তাদেরই বংশধর। এদের হিন্দুধর্মে ফিরে আসার পথে নানারূপ আপত্তি উত্থাপন করা বা প্রতিবন্ধকতা করা স্পষ্টতই অন্যায়।'

'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর অপর একটি জিজ্ঞাসা ছিল, যারা কোনওকালে 'হিন্দুসমাজভুক্ত ছিল না, তাদের সম্বন্ধে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন— 'অতীতকালে এইরূপ লক্ষ লক্ষ বিধর্মীকে হিন্দুধর্মে আনা হয়েছে আর এখনও সেরূপ চলছে।' ওই বক্তব্য প্রসারিত করে তিনি বলেছেন— 'আমার নিজের মত এই যে, ভারতের আদিবাসীগণ, বহিরাগত জাতিসমূহ এবং মুসলমানাধিকারের পূর্ববর্তী আমাদের প্রায় সকল বিজেতৃবর্গের পক্ষেই ওই কথা প্রযুক্ত হতে পারে। শুধু তাই নয়, পুরাণ সমূহে যে-সকল জাতির বিশেষ উৎপত্তির বিষয় কথিত হয়েছে, তাদের সম্বন্ধেও ওই কথা খাটে। আমার মতো যারা অন্যধর্মী ছিল, তাদেরকেও হিন্দু করে নেওয়া হয়েছে।' ('হিন্দু ধর্মের সীমানা', ওই)। সাক্ষাৎকারটি এবং মাদুরায় আলোচনা সভার বিবরণ যথাক্রমে এপ্রিল, ১৮৯৯-এর 'প্রবুদ্ধ ভারত' এবং ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭-এর 'হিন্দু' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

—**বিমলেন্দু ঘোষ,**
কলকাতা-৬০।

চিত্রতারকার শাস্তি

সলমন খানকে শাস্তি দিয়েছে যোধপুর আদালত। তাই নিয়ে সারা ভারতে শুরু হয়েছে সার্কাস। বলিউডের তারকাদের মধ্যে কেউ কেউ বলছেন, সলমনের নাকি অনেক দানধ্যান আছে। বহু গরিব মানুষকে তিনি নিয়মিত সাহায্য করে থাকেন। আমার প্রশ্ন, একজন মানুষ গরিবকে সাহায্য করেন— এই অজুহাতে তিনি কি দেশের আইন ভাঙতে পারেন? এর আগে সলমন খান মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে ফুটপাথবাসী নিরীহ মানুষ মেরেছিলেন। সেবারও আদালতের নির্দেশে তার কারাদণ্ড হয়। কিন্তু তিনি জামিন পেয়ে যান। যথারীতি বলিউড সেবারও পাশে দাঁড়িয়েছিল প্রিয় সহকর্মীর পাশে। উঠেছিল সলমনের গরিবসেবার কথা। বলিউডের তারকারা সম্ভবত ভুলে গেছেন সলমনের মামলার দুই সাক্ষীর একজনের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে, অন্যজন এখনও নিখোঁজ।

আপাতত সেই মামলা সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন। জানতে ইচ্ছা করে, সর্বোচ্চ আদালতও যদি কারাদণ্ডের রায় বহাল রাখেন তাহলে বলিউডের তারকারা কী করবেন?

—**অনিমেষ রায়,**
সোনামুখী, হাওড়া।

প্রেমনগরে খেলতে যাবি কে

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

‘প্রেমনগরে খেলতে যাবি চল।’ মনে পড়ে মান্না দে-র এই গান? কোন সিনেমার, তা মনে আছে? মতি নন্দীর লেখা ‘স্ট্রাইকার’ উপন্যাস প্রথম প্রকাশে যে হইচই ফেলেছিল, আমাদের ছেলেবেলার অভিজ্ঞতায় তা তুলনাহীন। একই নামে ওই সিনেমাটা চলেছিল মাত্র অল্প কিছুদিন। ভেবে অবাক লাগে, ভুলে যাওয়া এলেবেলে কত চলচ্চিত্রই তো টিভিতে ঘুরেফিরে এল, এত শত চ্যানেলের কল্যাণে নতুন নতুন হলো কত কী, কিন্তু ‘স্ট্রাইকার’ আর দেখাই গেল না!

বিশেষ করে মনে রেখেছি, ওই সিনেমায় ভিড়ের দৃশ্যে ছিলাম বলে। হাতা-গোটানো কমলা রঙের জামা পরে সবুজ গ্যালারির মাথার দিকে লাফালাফি করছি— দৃশ্যটা একবারের বেশি আর দেখতেই পেলাম না! সন-তারিখ তত মনে নেই, বেশ প্রশংসা করা হয়েছিল বড় সাপ্তাহিকে। নানান সীমাবদ্ধতা ও ভুলচুক সত্ত্বেও লেখা হয়েছিল, ‘এই যে কেউ একজন ভিন্নদিকে স্টিয়ারিং ঘোরানোর সাহস পেলেন—’ আবছা মনে আছে। সেই সাহসের জেরেই কি এমন সম্যক অবলুপ্তি? বিস্মৃতি?

অর্চন চক্রবর্তীর নামটা আবছা মনে পড়ে। মনে আছে, সুভাষ ভৌমিক সুন্দর পাজামা-পাঞ্জাবিতে সেজেগুজে মোহনবাগান মাঠের ধারে, মানে শ্যুটিং স্পটে ঘুরছিলেন বলে অনেকে তাঁকেই নায়ক-টায়ক ভাবছিল। আসল নায়ক শমিত ভঞ্জ তখন জার্সি পরে, মাঠে দৌড়ঝাঁপ করে ঘাম ঝরিয়ে ওই ছবির জেনুইন নায়ক চোর হবার চালিয়ে যাচ্ছেন। রমেন রায়চৌধুরিও জার্সি গায়ে— যিনি বড় পর্দায় বা সিরিয়ালে পরবর্তী বছরগুলোয় বেশ পরিচিত নাম হয়ে উঠবেন— স্ট্রাইকারে উনি আনোয়ার-এর রোলে। টিভি তখনও সেভাবে জাঁকিয়ে বসেনি। সতীন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন ক্লাব কর্মকর্তার ভূমিকায়, জোরদার সেজেগুজে এসেছিলেন, যেন যাত্রার নায়ক। চেনা অভিনেতা বলেই বুঝি অটোগ্রাফ নিচ্ছিল কেউ কেউ। ‘যুগের যাত্রী’ ক্লাব বিদেশি কোনও ক্লাবের সঙ্গে শিল্ড ফাইনাল খেলে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষে জিতেছে, গল্পে এমনই ছিল। সাদা-নীল জার্সি গায়ে, কিছু ফর্সা ফর্সা মঙ্গোলয়েড মুখের ছেলে ধরে আনা হয়েছে। লোকজন বলছে, ওদের এনেছে চীনেপাড়া থেকে, সব্বাই হয়তো জুতোর ব্যবসা করে!

সব্বার পাশে দাঁড়িয়ে, নানারকম মজা দেখছি। যতদূর মনে পড়ে, ‘যুগান্তর’ দৈনিকের দ্বিতীয় পাতায়, সিনেমা-থিয়েটারের ছোট ছোট বিজ্ঞাপনের পাশেই একটি ছোট্ট বক্স-এর বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল, সকাল আটটায় আপনারা মোহনবাগান মাঠে দলে দলে উপস্থিত থেকে ছায়াছবিতে অংশ নিন বা অমনই কিছু, অর্থাৎ ভিড় বাড়ান। এটাও মনে পড়ে, নির্ধারিত দিনে কী যেন টেকনিক্যাল গোলমালের জন্যে শ্যুটিং হলো না, গাঁইগুঁই করতে করতে ফিরে গেল সবাই। আমার তো ভালোই হলো, আরেকদিন ওই একইরকম তামাশা দেখার জুটে গেল সুযোগ— ওই দিনই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, পরের শ্যুটিং কবে! বেশিদিনের গ্যাপ নয়, কিন্তু পরেরটা মাঝ-সপ্তাহে স্কুল যাবার দিন। থাকগে, একদিন না হয় দেরি হলে হবে! বাড়ি তো আমার খুব বেশি দূর না, হনহনিয়ে হাঁটলে, মোহনবাগান মাঠ থেকে মাত্র আধ ঘণ্টা!

এগারো ক্লাসে উঠে বেজায় লায়েক হয়েছি, হেয়ারস্কুল থেকে, রাস্তা পেরিয়ে রোজ কফি হাউস যাচ্ছি, হ্যাঁ, সত্যি! এখন ভেবে হাসি পাচ্ছে, সিনেমার শ্যুটিং দেখতে যাচ্ছি— এটা বলতে বেশ লজ্জা পাচ্ছিলাম দিদার কাছে। আগের দিন গুল মেরে দিয়েছিলাম, ছোটকার জন্যে যুববাণীর ফর্ম তুলতে যাচ্ছি। সেই কাজ আবারও একটা দিন? এপ্রিলের সকালে রোদ বেজায় চড়া। দিদা অন্যদিকে চেয়ে বললেন, না যাওনই ভাল। ভাবছি, আজও আবার ক্যানসেল হবে না তো? ভাগ্য ভালো, খারাপ কিছু ঘটলো না।

ছুটির দিন নয় বলেই উৎসাহী জনগণ আজ বেশ কম। তাছাড়া, দশ মিনিটের ছবির জন্যে দু-তিনঘণ্টা সময় লাগে, আগের দিন এটা জেনেও যেন কিছু লোক ছিটকে গেছে। ময়দানে, খোলা মাঠে সবসময়েই এদিক-ওদিক বল পেটাপেটি করে কিছু ছেলে, তারাই বুঝে বা না বুঝে হুল্লোড়ে সঙ্গী হলো। মাঠের খেলা এবং দর্শক- হুল্লোড়ের ছবি, আলাদা ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ক্যামেরায় তোলা হলো। উৎসাহী অকর্মা, ঘরমুখো মর্নিং-ওয়াকার আর বল পেটানো ছেলেপুলেরা অনেকেই শ্যুটিং-ফুটিং বুঝছে না— শ্রেফ তামাশা দেখতে এসেছে, যখন তখন ফুটে যাবে বলেই তাদের চান্স আগে এল। এখনও নিজের শিরা-ধমনীর স্পন্দনে সবুজ গ্যালারিতে লাফিয়ে ওঠার উল্লাস টের পাই— জীবনে এ একটা ভিন্নরকম, অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা তো বটে।

মিনিট পনেরো-কুড়ির মামলা। যেমন ‘হ্যাট হ্যাট ছিদা ছিদা’ করে আমাদের তোলা হয়েছিল, নামানোও হলো সেভাবে। মাঠের সাইডলাইনে বসে, বেশ কিছুক্ষণ ওই মঙ্গোলীয় মুখোদের সঙ্গে বাঙালি একস্ট্রাদের পাসিং-ডজিং দেখা গেল, যতক্ষণ না মনে হলো, স্কুল যেতে বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, হেড দিয়ে গোল, গল্পে ঠিক যেমন ছিল, ওই চরমতম দৃশ্য তো দেখতে হবেই! চার-পাঁচ বার তোলা হলো দৃশ্যটা। পর্দায় কিন্তু সবমিলিয়ে জুড়ে গিয়েছিল বেশ। ■

অতি প্রয়োজনীয় ভেষজ নিমপাতা

সত্যানন্দ গুহ

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে নিম প্রধান ভেষজ। সর্বরোগহর ক্ষমতা রয়েছে। বৈদিক সূত্র বলছে— নিম অশুভ দূর করে। চারক-সংহিতা বলছে—সুতিকা গৃহের পার্শ্বে নিমগাছ থাকা ভাল। সদ্যোজাত শিশু নিমের গন্ধে জীবাণুর আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকে। অথর্ববেদ বলছে—নিমের রস শরীরের জ্বালা দূর করে, যক্ষ্মা রোগ দূর করে।

আমাদের দেশে শবদাহ করে এসে নিমপাতা চিবিয়ে ঘরে প্রবেশ করার রীতি আছে। নিশ্চয় শারীরিক কারণেই যুগযুগ ধরে এ নিয়ম চলে আসছে। নিমপাতার রস খেলে খিদে বাড়ায়, মুখে রুচি হয়। রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা প্রবল বলে নিম তেল, নিম পেস্ট, নিম সাবান ও নানা ওষুধ তৈরি হয়। নিম ও বীজ থেকে থেকে ভালো সার হয়। নিম তেল কীটনাশক।

খাওয়ার নিয়ম : সবুজ পাতা বেটে বা থেঁতলা করে ছেঁকে সকালে খালিপেটে রস খেতে হবে। পাতা ভাজা করে খেলে বায়ুর প্রকোপ বাড়বে। ভেষজগুণ কমে যাবে।

নিমে উপাদান আছে— বিভিন্ন রাসায়নিক যোগ, সালফার যোগ, ফ্যাট এসিড (৫২ শতাংশ)। আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্যের মতে— বসন্তকালে শরীরে রসাধিক্য ঘটে বলে নিম খাওয়া উপকার। যে-কোনও ঋতুতেই খাওয়া যায়। গাছের পাতা, তেল, বীজ, ছাল, কাঠ সবই উপকার। হিন্দুরা তাই নিমকাঠ পোড়ায় না।

অজীর্ণ, জন্ডিস, লিভারের ব্যথা, ব্লাডসুগার রাতকানা, ফোড়া, বমি, চোখ ঝাপসায়, শুকনো কাশি, রক্তদুষ্টি, ঘুসঘুসে জ্বর, ক্রিমি, অরুচি, মুখে ঘা, মাথাধরা, সর্দিগর্মি, চুলের অকালপক্বতা, চর্মরোগে, ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। অ্যালার্জি, যক্ষ্মারোগেও উপকার।

লিভারের ব্যথায় সকালে খালিপেটে নিমের ছাল একগ্রাম, কাঁচা হলুদ আধগ্রাম, আমলকির গুঁড়ো একগ্রাম জলে মিশিয়ে খেতে হবে।

ব্লাডসুগারে ১০টি সবুজপাতা, ৫টি গোলমরিচ খালিপেটে সকালে চিবিয়ে খেতে হবে।

মাথা ধরায় নিমবীজ গুঁড়ো নস্যির মতো ব্যবহার করতে হবে।

চুলের অকালপক্বতায় নিমতেল মাথায় মাখতে হবে। জন্মরোধেও বিশেষ কার্যকরী।

দাঁতের রোগে নিমপেস্ট, নিমপাউডার, নিমপাতার রস খুবই উপকারী।

মশাধ্বংসে নিম বীজের ছিবড়া থেকে যে নিমকেক তৈরি হয় তা অদ্বিতীয়।

নিম একটি অতি প্রয়োজনীয় ভেষজ। নানা রোগে উপকার করে।

দাদে, চুলের অকালপক্বতার নিমবীজের তেল মাথায় ২/৩ মাস মাখতে হবে। অরুচি, ক্রিমি, ঘুসঘুসে জ্বর, স্বপ্নদোষ, ঝাপসা দৃষ্টি, রাতকানা, জন্ডিস, ব্লাড সুগার ইত্যাদিতে অব্যর্থ।

সকালে খালিপেটে অবশ্যই কাঁচাপাতা চিবিয়ে রস নিয়ে খাওয়া উত্তম। পাতা ভাজা বা বেগুনে দিয়ে নিমবেগুন অপকার করে। বায়ুবৃদ্ধি করে। শুকনো কষা শরীর যাদের তাদের ক্ষতি করবে। কোনও কিছু খেয়ে, ভরা পেটে খাওয়া উচিত নয়। এর পাতা, ফুল, ছাল, বীজের তেল সবই ব্যবহৃত হয়।

উপাদান ও খাদ্যমূল্য :

প্রোটিন—২.০০ গ্রাম, ফ্যাট— ০.৩ গ্রাম, শর্করা—২.২ গ্রাম, তাপমূল্য—২০ ক্যালরি, ভিটামিন এ—২৭৩৬ মিলিগ্রাম, লোহা— ৬.৮ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম— ১৩০ মিলিগ্রাম, ফসফরাস—১৯০ মিলিগ্রাম।

(লেখক প্রাকৃতিক চিকিৎসক)

ভারতের প্রথম মহিলা জাহাজচালক রেশমা নিলোফার নাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ঘটনাটা এখনও ঘটেনি, ঘটবে। আর মাত্র ছ'মাস পর ভারতের প্রথম মহিলা জাহাজ চালক রেশমা নিলোফার নাহারের জাহাজ কলকাতা বন্দরে নোঙর করবে। কিন্তু তাতে কী! এখনই সাজো সাজো রব পড়ে গেছে চতুর্দিকে। ভারতের সর্বত্র তো বটেই, রেশমার খবর ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে।

ভালো করে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এই ঘটনা জনমানসে আলোড়ন তোলার মতোই। একটা জাহাজকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ কথা নয়। চালকের দক্ষতা সর্বোচ্চ মানের না হলে যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তার ওপর রেশমাকে জাহাজ নিয়ে আসতে হবে চেন্নাই বন্দর থেকে। পেরোতে হবে বঙ্গোপসাগর এবং হুগলী নদী। এখানেই লুকিয়ে আছে সব থেকে বড়ো প্রশ্নচিহ্ন। হুগলী নদীকে বিশ্বের অন্যতম বিপজ্জনক নদীপথ বলা হয়ে থাকে। একের পর এক বাঁক, চরা এবং অগভীর অঞ্চল পেরিয়ে কলকাতায় পৌঁছনো বেশ ঝক্কির ব্যাপার। সারা পৃথিবীতে নদীপথে জাহাজ চালানোর মহিলা পথিকৃৎ রেশমা এখন কলকাতা পোর্টট্রাস্টের নদী-বিশেষজ্ঞদের অধীনে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। রেশমা যথেষ্ট আশাবাদী। আত্মবিশ্বাসীও। বিশ্বাস করেন প্রশিক্ষণের পর নির্দিষ্ট সময়েই চেন্নাই বন্দর থেকে তার জাহাজের ভোঁ শোনা যাবে।

একটা সময় ছিল যখন মেয়েরা শুধু স্কুল-কলেজে পড়ানোর চাকরিতে সচ্ছন্দ বোধ করতেন। তারপর ধীরে ধীরে সরকারি- বেসরকারি অফিসেও তাদের উপস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে উঠল। গত কয়েক বছরে আমরা মেয়েদের অপ্রচলিত— এমনকী সাধারণভাবে বিপজ্জনক পেশায় আসতে দেখছি। কিছুদিন আগে যুদ্ধবিমানের পাইলট হয়েছেন মেয়েরা। এবার হলেন জাহাজের চালক। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, শুধুমাত্র দক্ষতার জোরে এই ধরনের পেশায় আসা যায় না। প্রয়োজন 'আমিও পারব'-জাতীয় মানসিকতা। ভারতীয় মেয়েরা যে ধীরে ধীরে এই মানসিকতা অর্জন করছেন সে কথা বলাই বাহুল্য।

ঠিক যেমন রেশমা। চেন্নাইয়ের মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে জাহাজ চালানোর পেশায় আসা সহজ ছিল না। তবুও তিনি এসেছেন ওই মানসিকতার জোরে। রেশমা মেরিন টেকনোলজিতে বি-ই পাশ করেছেন রাঁচির বিড়লা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি থেকে। তারপর চেন্নাইয়ের কনথপুরের এ এম ই টি-তে উচ্চশিক্ষা। নটিক্যাল সায়েন্স এবং মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং দুটিতেই পারদর্শিতা অর্জন করেছেন তিনি।

রেশমা কলকাতা পোর্টট্রাস্টে যোগ দেন ২০১১ সালে। তবে তার আগে আর একটা পর্ব আছে। প্রায় এক বছর রেশমা ক্যাডেট হিসেবে একটি সমুদ্র যাত্রায় অংশ নেন। যাই হোক, আবার ফিরে যাব রেশমার প্রস্তুতিপর্বের দিনগুলোতে। আন্নানগরের এসবিওএ ম্যাট্রিকুলেশনে পড়ার সময় এ এম ই টি-র একটি বিজ্ঞাপন তার চোখে পড়েছিল। তখনই তিনি সিদ্ধান্ত নেন জাহাজই হবে তার কর্মক্ষেত্র। তারপর ধীরে ধীরে একটার পর একটা ধাপ পেরিয়ে যাওয়া। কলকাতা পোর্টট্রাস্টের চাকরিতে যোগ দেবার আগে তিনি দু'বছর মার্কস লাইনে কাজ করেছেন।

কিন্তু কীভাবে পান এত ঝুঁকি নেবার সাহস? প্রশ্ন শুনে রেশমা হাসেন। বাবা-মার দিকে তাকান। বুঝতে অসুবিধে হয় না, অনুপ্রেরণার প্রধান উৎস তার পরিবার। বাবা-মা, ভাইবোন, বন্ধুরা। কোনওদিনই তিনি দশটা-পাঁচটার বাঁধাধরা কাজ পছন্দ করেন না। চ্যালেঞ্জ পছন্দ করেন। তাই এমন একটা কাজ বেছে নিয়েছেন যা তাকে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে চ্যালেঞ্জ করবে।

কলকাতা পোর্টট্রাস্টে যোগ দেবার পর রেশমা সেকেন্ড এবং ফার্স্ট মেটস কমপিটেন্সি সার্টিফিকেট পেয়ে গেছেন। সম্প্রতি গ্রেড থ্রি পার্ট ওয়ান পরীক্ষাও পাশ করলেন। এখন তিনি গ্রেড থ্রি পাইলট। আপাতত উপসাগর এবং নদীপথে ছোট জাহাজ চালাবেন। এরপর যখন আরও কয়েকটি পরীক্ষায় পাশ করে গ্রেড ওয়ান পাইলট হবেন তখন বড়ো জাহাজের দায়িত্ব দেওয়া হবে তাকে। সেই জাহাজের বহন ক্ষমতা ৭০,০০০ টন।

এত কিছুর পরেও রেশমা নিজেকে ফোটোগ্রাফার ভাবতে বেশি ভালোবাসেন। সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়েন। তার ল্যাপটপ ছবিতে ছবিতে ভর্তি। আর ভালোবাসেন সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখতে। এমন ভাবে হাসেন দেখে মনে হয় পাশের বাড়ির মেয়ে। বিশ্বাসই হয় না ওই মেয়ে হাজার হাজার নটিক্যাল মাইল পেরিয়ে যেতে পারেন। কাঁধে তুলে নিতে পারেন একটি আস্ত জাহাজের দায়িত্ব। ■

গল্প

বাঘছালের গল্প

ধৃতিমান, প্রণয় ও অম্লান। তিন বন্ধু সময় পেলেই বেরিয়ে পড়ে নতুন কোনও জায়গার উদ্দেশে। কখনও সমুদ্র, কখনও পাহাড়, কখনও বা মরুভূমি। এবারে কলেজের পরীক্ষা শেষ হতেই তারা ঠিক করলো বেড়াতে যাবে জঙ্গলে।

ধৃতিমান বলল—আমাদের উত্তরবঙ্গেই তো কত জঙ্গল, সেখানেই ঘুরে আসা যাক। প্রণয় ও অম্লানের প্রস্তাবটা পছন্দ হলো। ব্যাগপত্র গুছিয়ে রওনা দিল উত্তরবঙ্গের জঙ্গলের উদ্দেশে।

সারারাত ট্রেন জার্নি করে পরেরদিন পৌঁছলো শিলিগুড়ি। সেখান থেকে একটা গাড়ি নিয়ে চারিদিকে সবুজ ঘন জঙ্গল, চা-বাগান, হাতির রাস্তা পার হওয়া দেখতে দেখতে তিন বন্ধু পৌঁছে

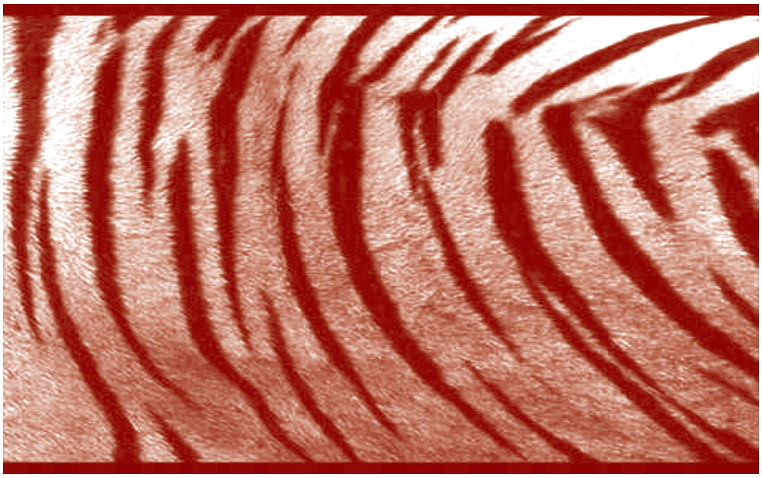

গেল রাজাভাতখাওয়া। কিন্তু সেখানে গিয়ে সমস্যা দেখা দিল থাকার জায়গা নিয়ে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বাংলো আগে থেকে বুক করে আসতে হয়। ওরা তা করেনি। একটি চায়ের দোকানে বসে ভাবতে লাগলো এখন কী করা যায়? চায়ের দোকানদার বলল— এখানে একটি বাড়ি আছে, ভাড়া পাওয়া যায়। তোমরা গিয়ে খোঁজ নিতে পারো। দোকানির কাছে ঠিকানা নিয়ে তিন বন্ধু মিলে পৌঁছলো সেই বাড়িতে। বাড়িওয়ালা বসার ঘরে ওদের বসতে দিল। অনেক বড় ঘর, অনেক আসবাবপত্র। ধৃতিমান সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। একটা জিনিসের উপর চোখ পড়তেই ওর দৃষ্টি থমকে গেল।

ধৃতিমানের কৌতূহল দেখে বাড়িওয়ালা বলল— কী দেখছ, ওটা বাঘের ছাল। আজ থেকে দশ বছর আগে একটা বাঘ মেরে আমি ওটা সংগ্রহ করেছি।

ধৃতিমান অবাক হয়ে বলল— আপনি বাঘ শিকার করেছেন?

বাড়িওয়ালা বলল— তা নয়তো কী। বিশাল আকারের বাঘ। জঙ্গল থেকে আনতে একটা মোষের গাড়ি ভাড়া করতে হয়েছিল। চল তোমাদের ঘর দেখিয়ে দিই।

বসার ঘরের পাশের একটি ঘর ওদের থাকার ব্যবস্থা হলো। বাড়িটির চারিদিকে ঘন জঙ্গল, বড় বড় গাছ মাথা তুলে আছে। এই জঙ্গলে বাঘ থাকাটা স্বাভাবিক। তাছাড়া সে উত্তরবঙ্গের চিতাবাঘের কথা শুনেছে। ঘরের দেওয়ালে বাঘছাল দেখার পর বিশ্বাস আরও বেড়ে গেল।

একটা লম্বা ঘুম দিয়ে বিকেলবেলা বসার ঘরে এলো ধৃতিমান। একজন বৃদ্ধ তখন সেখানে বসে আয়েশ করে হুকো খাচ্ছিল। বাড়িরই কেউ হবে। ধৃতিমান দেওয়ালের সেই বাঘছালের দিকে তাকাচ্ছিল। তা দেখে বৃদ্ধ বলল— জানো এই বাঘছালের ইতিহাস?

ধৃতিমান মাথা নাড়িয়ে বলল— না।

বৃদ্ধ বলল— আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে, আমি তখন জোয়ান ছিলাম। গিয়েছিলাম জঙ্গলে বেড়াতে। হঠাৎই একটি বাঘ আমায় আক্রমণ করে। আমার গায়ে তখন খুব জোর। বাঘটির দু-পা ধরে দু'পাক ঘুরিয়ে দিলাম এক আছাড়। বাঘ বেচারা আর উঠতে পারেনি। সেই বাঘের ছাল এটি। প্রায় এক টন ওজন ছিল বাঘটির।

একটি বাঘের ছাল, তা নিয়ে দু'জনের দু' রকম কথা। কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে কে জানে। রাতে শোয়ার সময় প্রণয় ও অম্লানকে দুটি গল্পই শোনালো ধৃতিমান। প্রণয় বলল— তার মানে এরা কেউই বাঘশিকারি নয়। আমাদের কাছ থেকে ক্রেডিট পাওয়ার জন্য বানিয়ে বানিয়ে গল্প করছে।

পরের দিন ভোরে পাখির ডাকে ঘুম ভেঙে গেল ওদের। তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে পড়লো সকালের জঙ্গল দেখবে বলে। বেরোবার সময় দেওয়ালের দিকে নজর গেল ধৃতিমানের। আশ্চর্য, বাঘছালটি দেওয়ালে নেই। কাল রাতেই সে বাঘছালটি ওই দেওয়ালে দেখেছে। তাহলে কি এর পেছনে রয়েছে অন্য কোনও রহস্য?

জঙ্গল থেকে ফিরতে ফিরতে অনেক বেলা হয়ে গেল। বাড়িতে ঢুকতে গিয়েই ধৃতিমান খেয়াল করলো দূরে রোদে জামা-কাপড় শুকোতে দেওয়া, সেই সঙ্গে দেওয়ালের সেই বাঘছাল। বাঘছাল কী কেউ ধুয়ে শুকোতে দেয়!

মনের মধ্যে কৌতুহল হলো। প্রণয় ও অম্লানকে ভেতরে যেতে বলে সে এগিয়ে গেল রোদে শুকোতে দেওয়া সেই বাঘছালের দিকে। কাছে গিয়ে দেখল সত্যি সত্যি জামা-কাপড়ের সঙ্গে সেটাকেও ধুয়ে শুকোতে দেওয়া হয়েছে। এবার সে হাত দিল সেই বাঘছালে। আশ্চর্য! এতো বাঘের ছালের মতো রঙ করা একটি কাপড়! বাঘের ছাল নয়। তার মানে গতকাল থেকে যে বাঘছাল নিয়ে তারা নানা কাহিনি শুনলো সেটি আসলে একটি কাপড়ের তৈরি বাঘছাল। আসল বাঘের ছাল নয়। দু'জন ব্যক্তির এমন মিথ্যাচার দেখে ধৃতিমান মনে মনে একচোট হাসল। ভাবল এই সত্যটি না জানলেই ভালো হতো। তাহলে ভ্রমণটা আরও রোমাঞ্চকর হতো। তাই সে প্রণয় ও অম্লানকে সত্যিটা আর খুলে বলল না।

ভারতের পথে পথে

ঊনকোটি

ত্রিপুরা রাজ্যের কৈলাশহরের কাছে ঊনকোটি তীর্থক্ষেত্র। আগে নাম ছিল ছাম্বুল। শাল, সেগুন, দেবদারু ও চন্দন গাছে পরিপূর্ণ অরণ্যময় এই শৈবতীর্থের পুরো পাহাড়টাই ভাস্কর্যময়। মূর্তি রয়েছে শিব, হরগৌরী, সিংহবাহিনী দুর্গা, পঞ্চমুখী শিব এবং ৩০ ফুট মুখমণ্ডলের বিশালাকার কালভৈরব-বাসুদেব, রাম-লক্ষ্মণ, হনুমান, গণপতি। পাহাড় জুড়ে রয়েছে নানান পৌরাণিক দেব-দেবীর মূর্তি। অনুপম ভাস্কর্যের নিদর্শন। ৩ মিটার দীর্ঘ শিবের নিখুঁত জটা। সারা বছর তীর্থযাত্রীদের ভিড় লেগে থাকে। অশোকষষ্ঠী, পৌষসংক্রান্তিতে মেলা বসে।

জানো কি?

ভৌগোলিক শব্দগুলির অর্থ :

- মৌসুমি—ঋতু (আরবি শব্দ)।
- রাঢ়—পাথুরে জমি।
- তুন্দ্রা---শৈবাল বা বরফঢাকা অঞ্চল।
- মাইক্রোনেশিয়া—ক্ষুদ্র দেশ।
- বিষুব—দিন-রাত্রি সমান।
- অহ্ন—দিন।
- আয়ন—পথ।
- দুন—অনুদৈর্ঘ্য এলাকা।
- চোমোলাংমা—এভারেস্ট (তিব্বতি শব্দ)।

ভালো কথা

হাতির চিকিৎসা

সেবার পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে এক ডাক্তারবাবু সঙ্গে আমরা দেখা করেছিলাম। তাঁর কাছে নাকি বনের জন্তুজানোয়ারও চিকিৎসা করাতে আসে। ডাক্তারবাবু বললেন বাঁদর, হনুমান তো আসেই, কয়েক বছর আগে একটা হাতির চিকিৎসা করেছিলাম। ভোরে হাতির চিৎকার শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম, ওর কিছু হয়েছে। দরজা খুলতেই শুয়ে পড়ে একটি পা বাড়িয়ে দিল। দেখলাম— পায়ে সুঁচালো কাঠ ঢুকে রয়েছে। ঘা হয়েছে। আমি ও আমার স্ত্রী দুজনে কাঠ বের করে ওষুধ দিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিলাম। ১ ঘণ্টা শুয়ে থেকে সূর্য ওঠার আগে আমাদের দিকে শুঁড় নাড়িয়ে নমস্কার করে চলে যায়। বাবা বললো, আপনার ভয় করেনি? ডাক্তারবাবু বললেন, আমি ওদের চোখের ভাষা পড়তে জানি।

স্নেহাংশু দাশগুপ্ত, দ্বাদশ শ্রেণী, স্কুলডাঙ্গা, বাঁকুড়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

মায়ের চিন্তা

মৌনব দাস, সপ্তম শ্রেণী, কলকাতা-৬

আজকে আমার মাথায় ব্যথা,
জ্যাঠা বলল, ঠাণ্ডায় খেলতে গেলি
শুনলি নাকো মায়ের কথা।
আমি বলি, মাগো তুমি এত চিন্তা কর কেন
হয়নি তো ভীষণ জ্বর,
তুমি ভাবছ কঠিন কিছু হলো যেন।
ডাক্তারখানা গিয়ে একটি ওষুধ খেলে
তুমি বলবে হয়ে গেলি ঠিক,
তখন তোমার চোখ করবে ঝিকমিক।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

ফিরে দেখা

হিন্দুধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নববর্ষ

স্বামী মৃগানন্দ

শুভ নববর্ষ। নববর্ষ শুভ হোক, মঙ্গলময় হোক, শান্তি-কুশলময় হোক, এই প্রার্থনা জানিয়ে দু'চারটি কথা নিবেদন করি এই শুভদিনকে উপলক্ষ্য করে।

হিন্দুদের সৌর বৈশাখী সংবৎসর উপলক্ষ্যে পালিত নববর্ষের উৎসব অনুষ্ঠানকে মুসলমান নবাব বাদশাদের দ্বারা প্রবর্তিত হালখাতা দিবসরূপীর নববর্ষ বলে প্রচার করার একটা প্রবণতা পশ্চিমবঙ্গের প্রচার মাধ্যমগুলিতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সেটা কিন্তু ঠিক মনে হয় না। আজকের ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকোপে হিন্দুধর্মের অনেক কিছুই বিকৃতরূপে পরিবেশিত হয়ে থাকে। 'পূজা' 'অর্চনা' ইত্যাদি ধর্মানুষ্ঠান দ্যোতক শব্দকে বর্জন করে শুধুমাত্র 'উৎসব' কথাটির প্রয়োগ-বাহুল্য এইরকম একটি দৃষ্টান্ত। বৈশাখের প্রথম দিনের পুণ্য লগ্নও সে প্রকোপ এড়াতে পারেনি। তবে এটাকে তুচ্ছ করেই বৈশাখের উজ্জ্বল প্রভাত ধর্মের গৈরিক আভা নিয়েই আর্ভিত হয় প্রতি বছর। কারণ ধর্মসূর্যকে বেশীক্ষণ আড়াল করা যায় না ধর্মনিরপেক্ষতার কৃত্রিম মেঘ দিয়ে।

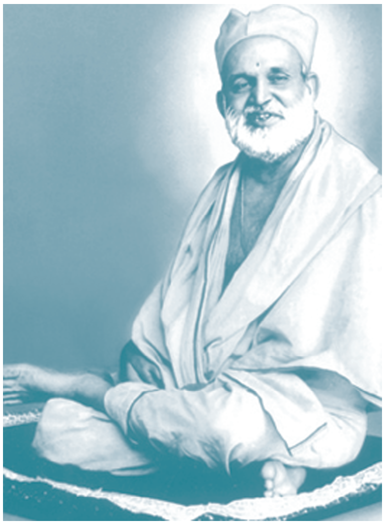

স্বামী সত্যানন্দ দেব

তবে নববর্ষ উপলক্ষ্যে হালখাতার প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সারা দেশে প্রাচীনকাল থেকেই এই নববর্ষের দিনটিতে হয়ে থাকে পঞ্চাঙ্গ পূজন। সৌর সংবৎসরকে প্রথম দিন ধরেই বাণিজ্য বর্ষ আরম্ভ করা এবং খাতা বই-এর পূজা করা বহু যুগ ধরেই প্রচলিত ছিল এদেশে। হিসাব নিকাশের ক্ষেত্রে চৈত্রের শেষ ও বৈশাখের শুরু যেন প্রকৃতি নির্দেশিত পুণ্যক্ষণ।

চৈত্রের শেষে প্রকৃতিতে ফুটে ওঠে ঝরাপাতার শুষ্কতা, রুক্ষতা, আর কালবৈশাখীর তাণ্ডব। ঝরা পাতার স্তূপ এবং জমানো আবর্জনা আর জঞ্জাল রাশিকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে যায় ঝড়ের সম্মার্জনী। সেই সদ্য পরিষ্কৃত পরিবেশে উন্মীলিত হয় নব কিশলয়। গাছের শুকনো শাখায় সবুজ পাতার নবোদ্‌ভিন্ন সমাবেশ মনকে করে তোলে আশার সবুজে প্রাণচঞ্চল। শুধু কি তাই? কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে প্রভাতী সূর্যের আভার মতো লালচে গেরুয়া আগুন রঙের ওই ফুলের রাশি প্রাণের কোণে জ্বেলে দিতে চায় তপস্যার অগ্নিশিখা। চৈত্রের শেষ লগ্ন যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে আর বলে—তোমার যা কিছু আকলিত জঞ্জাল, লোভ আর মোহের সঞ্চয়, অহং-এর পুঞ্জ পুঞ্জ আস্ফালন সব দিয়ে দাও আমার আগ্রাসী হোমানলে। রাত্রিশেষে আমি তোমাকে বলব— সুপ্রভাত।

পশ্চিমবঙ্গবাসী আমরা সত্যিই এক অবিস্মরণীয় চৈত্র সংক্রান্তি আর জ্যোতির্ময় প্রথম বৈশাখের সাক্ষী। সদা অতীত ইতিহাসের সেই পুণ্যলগ্নের কথা সকলেরই জানার মতো।

কলকাতার বরানগরে পবিত্র গঙ্গার তীর। উন্মুক্ত আঙিনার এক কোণে ফুলন্ত কৃষ্ণচূড়া গাছ। প্রাচীন তপোবনের মতো ঋষির আশ্রম, স্বচ্ছ কাঁচের মন্দিরে সারদামণি, রামকৃষ্ণদেব ত্রিনয়নী মায়ের জীবন্ত- প্রতিম প্রতিমা, গোপালের মন্দির, নাট মন্দির, নারকেল গাছ, আমের গাছ, কত রকমারি ফুলের গাছ আর লতা শোভিত কুঞ্জ। সেই মনোরম গঙ্গাতীরের বারান্দায় উপবিষ্ট রয়েছেন শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব। তাঁর একপাশে রয়েছেন ত্যাগী সন্ন্যাসিনী মাতৃমণ্ডলী, অন্যদিকে রয়েছেন ত্যাগী সন্ন্যাসীর দল। বারান্দা থেকে সাতটি সিঁড়ি নেমে এসে যেখানে উঠোনে পড়েছে সেখানেই একজন সন্ন্যাসী জ্বেলেছেন উজ্জ্বল হোম শিখা। উঠোনে হোমাগ্নির সন্নিকটে উপবিষ্ট রয়েছেন বহু ভক্ত ও সন্ন্যাসীবৃন্দ। চৈত্র শেষের হোমে পূর্ণাহুতির পূর্বলগ্নে শ্রীঠাকুর জলদগম্ভীর অতলস্পর্শী কণ্ঠে বলছেন কিছু মন্ত্রোপম কথা—'আজি এই হোমশিখার বুকে—সব ব্যথা, সব জ্বালা, গত জীবনের সব অর্ঘ্য দেওয়া কি হলো? মৌন প্রাণের এই নিবেদন— হে দেবতা লুণ্ঠিত হোক এই চরণে এই মোদের আকিঞ্চন।'

তাই নববর্ষের হালখাতা শুরু করার আগে চাই সারা বছরের হিসাব নিকাশ। বাস্তবে ব্যবসা বাণিজ্যের স্থূল ক্ষেত্রেও যেমন এটি প্রযোজ্য, তেমনি প্রযোজ্য আমাদের মনের রাজ্যে, অন্তরের সূক্ষ্ম রাজ্যে। বাইরের খাতার মতোই খতিয়ে দেখতে হবে অন্তরের খাতাটিকেও। শ্রীসত্যানন্দদেব বলতেন— 'ধর্মের খাতায় জমা খরচ দেখা চাই। সারা বছরের হিসাব নিকাশ দক্ষ হিসাব পরিদর্শকের হাতে করিয়ে নিতে হয়। গুরুই এর অডিটার। লাভক্ষতির হিসাবে তাঁর স্বাক্ষর হওয়া দরকার। আর তারই ওপর নববর্ষে নতুন খাতা যেন আমরা খুলতে পারি— পুণ্যমনে, ইষ্টকে সাক্ষী করে। আমাদের ধর্মজীবনের নতুন খাতার প্রথম পাতায় অঙ্ক যেন লাভের কোঠায় থাকে।'

(লেখাটি বাংলা ১৪০২ নববর্ষ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত)